পরিবর্ত্তনের নিয়মে প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, এই পরিণতির ব্যাপারে হয় ত অনার্য্যভাষাগুলি কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার অনেক কাল পরে, প্রাকৃত সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। প্রাকৃত যখন সাহিত্যে উঠিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয়; ইহার পূর্ব্বে তাহার পরিচয় আমরা পাই না। অথচ যে সময়ের সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই, সেই সময়েই সে হইয়াছে, তাহার আগে সে ছিল না, এমন কথাও বলা চলে না। সুতরাং "ইহা এই সময়ের প্রাকৃত", তামা-তুলসী ছুঁইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও এই একই কথা। ধরুন, 'জল' শব্দ সংস্কৃতে আছে, কিন্তু ইহা কোন্ সময়ের সংস্কৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? যে দিন সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই দিনই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি, ইহার আগে তাহার একটিও ছিল না, এ কথা কোন ভাষাবিৎ স্বীকার করেন কি? সুতরাং "ইহা কোন্ সময়ের প্রাকৃত", এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করা বৃথা। তবে, অমুক সময়ের লেখা পুথিতে পাওয়া যায়—এরূপ বলা চলে। পক্ষান্তরে এ প্রশ্ন সংস্কৃত সম্বন্ধেও উঠিতে পারে।

রায় মহাশয় উপসংহারে বলেন,—"যখনই প্রাকৃত বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ 'প্রাকৃত' ভাষা।"—(৬৮ পৃঃ।) ইহা কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ প্রাকৃত বৈয়াকরণিকের মত বটে। ইঁহারা বলেন,—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত আগতং তত্র ভবং বা প্রাকৃতম্।" অথবা "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তদ্বিকৃতিঃ প্রাকৃতম্।" কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক দিন আগে এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রকৃতি সংস্কৃত, ইহা বৈয়াকরণিকদের রচা কথা, কোন যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে। আর সংস্কৃতের বিকারে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তাহার "প্রাকৃত" নাম না হইয়া "সাংস্কৃত", "বিকৃত" বা "বৈকৃত" এইরূপ একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং দেখা যায়, উপরোক্ত মত সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধং প্রাকৃতম্।" এই মতই যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে। যে ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন, যাহা সংস্কারাপন্ন নহে, তাহা প্রাকৃত। আদিম মানব-সমাজে যখন শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবই হয় নাই, তখন সংস্কৃত ভাষার স্থান কোথায়?

"অতিথ" শব্দ সম্বন্ধে দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক; সেখানে 'অতিথ' শব্দের "ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী" অর্থ একেবারে অপরিচিত। সেই ধারণাবশতই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গে ইহার মূল অর্থ একেবারে গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে এখনও আছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"বাঙ্গালা শব্দকোষ রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশবিশেষের শব্দকোষ, ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে।" "কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতরবিশেষ হয়",—(৬১পৃঃ) ঠিক কথা। অতএব, আউ প্রভৃতি শব্দেরও এককালে গৌরব ছিল, এককালে উহাও সাধু এবং শিষ্ট

বলিয়া পরিচিত হইত, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহার সেই অতীত শিষ্টতা ও সাধুতা লোপ করা কোষকারের উচিত নহে।

কথ্য বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী অনেক স্থলেই মৃদু উচ্চারণে অভ্যস্ত। তাই মৃদু উচ্চারণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এক একটি গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া দেখুন, প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ কেমন কোমল হইয়াছে, আবার বাঙ্গালায় তাহা হইতেও কোমল হইয়াছে। সং ব্রাহ্মণ, প্রাং বামহণ, বাং বামন বা বামুন। কথ্য ভাষায় রেফাক্রান্ত যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হিসাবে কথ্য ভাষায় কর্ম্ম শব্দের পরিবর্ত্তে "কম্‌ম" ও "কাম" উচ্চারণই স্বাভাবিক। রায় মহাশয় বলেন,—"কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না।"—(৬২পৃঃ) আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারা দেখিয়া কাহার পক্ষে কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর উচ্চারণ কোমল—তাহাই তাহার বিশিষ্ট ধারা।

শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তরে রায় মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিলাম। পরিশেষে বক্তব্য, বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আজকাল আর আপত্তি চলে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি, মানুষ প্রথমে শিক্ষিত হইয়া জন্মে নাই, ভাষাও প্রথমে সংস্কৃত হইয়া জন্মে নাই। মানুষ অশিক্ষিত হইতে শিক্ষিত হয়, ভাষাও অমার্জ্জিত হইতে মার্জ্জিত হয়। মার্জ্জিতের সাধুতা, শিষ্টতা, গৌরব ও অসাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহার মূল যে "অমার্জ্জিত", এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক দিকে মার্জ্জিতের যেমন অসাধারণ গৌরব, অপর দিকে অমার্জ্জিতের তেমন চমৎকার সরলতা, প্রাণ-মন-ভুলান মধুরতা। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালার নমুনা, "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পাইয়াছি, তার পাঁচ শ বছর পরের "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পাইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এখনও কি বলা চলে যে, বাঙ্গালা সংস্কৃতজ?

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ*

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর "টপ্পা" এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধুবাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাঙ্গালায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার "বাঙ্গালার শোরি মিঞা" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা একেবারে নিষ্ফল নহে। আধুনিক রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে নিধুবাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধুবাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তদ্রচিত "গীতরত্ন গ্রন্থ" ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়।[১] ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাগারে আছে। ইহা নিধুবাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার "তদাত্মজ[২] জয়গোপাল[৩] গুপ্ত" কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত[৪] হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণ[৫]। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৫৭ সালে প্রকাশিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ইহার পত্রসংখ্যা।৶, + ১৪১। পরিষদ্গ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ। / শরণং / গীতরত্ন / গ্রন্থ / শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনী সহিত সঙ্কোলিত হইয়া / সন ১২৪৪ শালে / কলিকাতা বিদ্যোদ প্রেষে / মুদ্রিত হইল। / এই পুস্তক শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেনের / ইঁ ষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন। /

২। *Bengal Academy of Literature* (Vol I. No 6. p. 4)এ জয়গোপাল গুপ্তকে ভ্রমক্রমে নিধু বাবুর অনুজ বলা হইয়াছে।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে ভ্রমক্রমে জয়চন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সঙ্কলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে "পক্ষীর দল" ও আখড়াই গাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। / গীতরত্ন গ্রন্থঃ। / ৺রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। / কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত / তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। / নং ৬১ আহীরীটোলা। / ১২৭৫। / মূল্য এক টাকা চারি

হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কণ উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, একটি শ্যামাবিষয়ক গীত ও একটি বাণী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, "এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুধাসিন্ধু-যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।" ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্যান্য লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর তাঁহার "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে" বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন[৬]। তাহাতে নিধুবাবুর রচিত সার্দ্ধশতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারানুসারে গান বিন্যাস করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" বা "কবিবর নিধুবাবু-রচিত গীতাবলী" পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাটতি সম্ভাবনায় নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরাপর ব্যক্তির রচিত এবং নিধুবাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত "গীতাবলী" বা "নিধুবাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীতসংগ্রহ" পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধুবাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

আনা মাত্র।/ ইহার পত্রসংখ্যা ২+১।০+১৪৮ (১৪০ পৃঃ পর্যন্ত টপ্পা। ১৪১—১৪৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সংগীতাদি)।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—৩১২ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধুবাবুর অনেকগুলি গীত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকাসম্বলিত "রসভাণ্ডার" (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতি-গীতি" (১৩০৫), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

নিধুবাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থখানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায়[৭] নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে,—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

কিন্তু তারাচরণ দাস-রচিত "মন্মথ-কাব্য"এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সই ছিল রে মনে।
জাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥ হে
চিত্রা কি চিত্রে চিত্রে রহিলে কেনে।
যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥[৮]
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

উদ্ধৃত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্য অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল ঐক্য দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রবলপ্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে" মন্মথকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মন্মথকাব্যের প্রায় ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটতলা-প্রকাশিত নিধুবাবুর "গীতাবলী"র ভূমিকায় ও "মন্মথ-কাব্য"র ১২৬৯ সালে

৭। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ আছে, তাহা (অন্য সংকেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

৮। এই দুই পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মদনমুঞ্জরির মনমোহনের চিত্রপট দর্শন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্মথকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞায় প্রণীত মন্মথ-কাব্য প্রায় এক শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "রামনিধি ১২৪৪ সালে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্ব্বাচন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।" এই মতের বিরুদ্ধে দুএকটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্য, ইহার কোনখানি অপরটির পূর্ব্বে রচিত। আমরা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে একখানি মন্মথ-কাব্য পাইয়াছি, তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে,—

শাকে যুগ্মরসাব্ধিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পূষণি
পক্ষে নন্দসুতস্ত নামমিলিতে বারে বিধৌ বাণতিথৌ
বাবু শ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপায়ামারাখ্য কাব্যং শুভং
শ্রীতারাচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতং ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্মথ-কাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্মথকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের ৩ বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্ব্বত্র "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" এইরূপ ভণিতা আছে; কুত্রাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মনমথ কাব্য রচি ভাবি শারদায় ॥" (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধুবাবুর অশক্তাবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন।[৯] নিধুবাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত

৯। গীতরত্ন, পৃঃ ৫/০; সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১।

গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণকৃত এক আধটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধুবাবুরই রচিত; তারাচরণ স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্য সেগুলি নিজের রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্মথ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত "যোজনগন্ধা", মুন্সী এরাদোত-প্রণীত "কুরঙ্গভানু" (১২৫২) প্রভৃতি কাব্যে গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে দুএকটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্মথকাব্যে উদ্ধৃত (পৃঃ ১২০) "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন"[১০] গানটি নিধুবাবু তাঁহার প্রথম স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ, এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধু বাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূরিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।" অবশ্য গীতরত্নে অনবধান প্রযুক্ত অপরের দুএকটি গান আসিয়া পড়ে নাই অথবা নিধু বাবুর দুএকটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধরূপে সংগৃহীত হয় নাই; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোন্‌টি কাহার পদ,

১০। গীতরত্ন, পৃঃ ১৯।

তাহা নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে এরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এত কাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

একাদিক্রমে শ্রীধর কথক, রাম বসু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। "নয়নেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥" অথবা "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" (পৃঃ ৮৭৫ ও ৮৫১), "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ১২৩ ও ১২৭), "রসভাণ্ডার" (পৃঃ ১০৭) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে ; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ "তবে প্রেমে কি সুখ হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥" ইত্যাদি সুন্দর গানটি "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ৩৭৬) ও "নিধু বাবুর গীতাবলী" (পৃঃ ১৭২) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে ; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। টপ্পা রচনায় নিধু বাবুর এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" (পরিষৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪) "ককারে আকার অর ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঈকার বল" শীর্ষক উদ্ভট গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু ইহা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী রামলোচন ঘোষের পুত্র "গীতাবলী"-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—"আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ১৪৮) আছে ; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, ছাতু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তর গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরাগে রচিত "কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন" গানটি "গায়নহৃদয়কুমুদ"[১১] ২৬ পৃষ্ঠায়

১১। গায়নহৃদয়কুমুদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বংশীধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বটতলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্ট হইবে; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর শ্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নব্রজকুমদের (পৃঃ ২৪) "দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন" গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ২৭) পাওয়া যাইবে। "সঙ্গীত-সারসংগ্রহে" (পৃঃ ৮৭৪), বটতলা-প্রকাশিত "নিধু বাবুর গীতাবলী"তে (পৃঃ ১৭২), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের "বঙ্গের কবিতা"য় (পৃঃ ২৯৪)

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক এ দেহে সকলি সবে॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক-রচিত[১২] এবং গীতরত্নে বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান পলক নিশ্চিত প্রাণ
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই আমি মাত্র এই চাই
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে সব সবে॥

এমন কি, "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা"য় (পৃঃ ৪০) "পিরীতি পরম রতন" শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়! এই সমস্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিশুদ্ধরূপ উদ্ধার বা নির্ব্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এত কাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীত-সংগ্রহ[১৩] বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।[১৪]

১২। প্রীতি-গীতি, পৃঃ ৪১১।

১৩। পরিষৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের ভূমিকায় (পৃঃ ৪) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রামনিধি গুপ্তকৃত "গীতাবলী"র উল্লেখ আছে; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাইয়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসংখ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে নিরস্ত রহিতে হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।" (গীতরত্ন, পৃঃ ৸৴০)

এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবনবৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত; নিধুবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধুবাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে সুখচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৫ বৎসর বয়সে[১৫] নিধুবাবু নিজ পল্লীবাসী ছাপরা কালেক্টারের দেওয়ান রামতনু পালিতের আনুকূল্যে উক্ত কালেক্টারীতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন এবং নিধুবাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাপরায় অবস্থানকালে নিধুবাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়কের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি ওস্তাদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালায় টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসর[১৬] ছাপরায় কর্ম্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে দেওয়ান জগন্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সদাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে নিধুবাবু শোকাকুল হইয়া "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন" (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধুবাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত

১৫। *Bengal Academy of Literature*, Vol I. no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit. ibid.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন?

হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিঝাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে[১৭] একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধুবাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিমতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিত্র-গঠিত "পক্ষীর দলের"ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গঞ্জিকা-সেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন এবং নিধুবাবুকে তাঁহারা যথেষ্ট মান্য করিতেন[১৮]। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছু দিন নিধুবাবুর বৈঠক হয়। নিধুবাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়ালা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উদ্যোগে ১২১২-১৩ অব্দে[১৯] দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধুবার নিকট শিক্ষা করেন।[২০]

উক্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধুবাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুএকটি অপবাদ ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গণা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত

১৭। প্রভাকরে প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজারস্থ বটতলানিবাসী এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছদ্দি রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৸৶০। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক ২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।" (গীতরত্ন, পৃঃ ।৵০, সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ সুখ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধুবাবু দেহ ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতকুশলতা নহে, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরাজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক ; যথা—

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাধান ॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর খাস, হয় ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১)[২১]

ভারতচন্দ্রের ন্যায় পারস্য হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রীতি-গীতি"র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন[২২] যে, নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে, আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই টপ্পা এবং

২১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলিতে মূলের বানান ও পংক্তিবিন্যাস অবিকল রাখা হইয়াছে।
২২। প্রীতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২।৵০।

আদিরস অর্থে এখানে হীন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বিকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে "টপ্পা" হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং টপ্পা গীতের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত" দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায় গীত-রচনার রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক্ রীতির নাম টপ্‌পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"[২৩]

নিধুবাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, অন্য দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের "কামিনীকুমার", "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরণের বিকৃতরুচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মদনমোহনের "বাসবদত্তা"য় প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে রাম, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্ট‍্নি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা যে, কবিগান খেউড়, উহা অশ্লীলতাময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেরূপ ছিল না; রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অন্যান্য পুরাতন জিনিষের ন্যায় যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর সমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কবিগান তখন খেউড় না হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদি বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সকল কবিওয়ালাদের প্রতিভা ও তন্ময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা যাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন

২৩। "সঙ্গীততানসেন" গ্রন্থে (১২৯৯) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে—ধ্রুপদ ও রঙ্গীন গান। ধ্রুপদ গান প্রায় ২৪ প্রকার ও রঙ্গীন গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। খেয়াল ও টপ্পা রঙ্গীন গানের এক বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৬৬-৬৯)। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙ্গালা রঙ্গীন গানের স্থান দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্যের এই দুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের যেরূপ প্রতিপত্তি ও কবিগানের যেরূপ আদর, তাহাতে নিধু বাবুর ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা বা কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্য দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেয়াল ও টপ্পা ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যা-সুন্দরের নাম-গন্ধও নাই। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীন-ভাবে গাহিয়াছেন, পরকীয় ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্জ্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অনুভূতি বা অন্তর্জ্জগতের কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অনুভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অল্প-বিস্তর অন্তর্জ্জগৎ লইয়া; আপনার সুখ-দুঃখের কথা অথবা আত্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোঝা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাষা ও কাঠামো বজায় রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।

বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক্ গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি এক জন গুণজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সুখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমাগত অযথা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি যে, মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় রসজ্ঞ লেখকও "অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ" বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।[২৪]

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক অযথা অশ্লীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের

২৪। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্য্যায়), ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮)। গত বৎসরের নারায়ণ পত্রিকায় 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নিধু বাবুর প্রতি অবিচারে উত্তপ্ত হইয়া এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭০৪)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার বড় দুঃখিত।

অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট"। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংযত ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র; ইহা "আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র"।২৬ অবশ্য এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে মোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জ্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সে কালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-নাগাদ ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। দুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্ব্বত্র সঙ্গত এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও "নিধুর টপ্পা" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চ্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্যই বোধ হয়, নিধু বাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই।

নিধুবাবুর রচনায় কারিগরি বিশেষ না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা, সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অমনোযোগী, তথাপি সাদাসিদে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতায় প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবেন না; চরণের মিল, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধুবাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। অনেকে আবার হয় ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো পছন্দ করিবেন না। নিধুবাবুর অতি অল্প গানই আছে, যাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ

২৬। রস-ভাণ্ডার (বসুমতী কার্য্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ ৵০-৶০।

রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।২৭

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অন্তরা ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধুবাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সাধিলে করিব মান কত মনে করি
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দ্দোষ নহে। নিধুবাবুর টপ্পায় এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পার ভাব কদর্য্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিতাই নিধুবাবুর গানের বিশিষ্টতা।

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধুবাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ব্ব হইতে একটা মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বসেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুরলয়ে গঠিত করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নহে, সহস্রতন্ত্রী হৃদয়বীণায় প্রেমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে নূতন নহে; কিন্তু প্রেমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরমুগ্ধকর। যুগে যুগে কবিগণ প্রেমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই অপূর্ব্ব অনুভূতির আলোক বিভিন্ন কবি-হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্যান্য মধুর প্রেমসঙ্গীতের সহিত নিধুবাবুর রচনাও গীত-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবুর প্রেম-সঙ্গীত যে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক নহে, আমরা নিধুবাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রায় সমস্ত টপ্পাগুলিই প্রেম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

২৭। সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪৭

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৭৭)

প্রেমমুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহারা—

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে॥—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

যে প্রেম জানে না, সে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়; প্রেমের সুখ-দুঃখই জীবনের প্রধান অনুভূতি—

নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে॥—(ঐ, পৃঃ ২১)

কিন্তু প্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নহে; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মন্থন-ধন প্রেম জীবনের একটি বাস্তব অনুভূতি। যত দিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধুবাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির প্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের মতে প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্য আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ন্যায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই জন্য তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু প্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্য রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বস্তু। 'উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায়।" (গীতরত্ন, পৃঃ ১০৯)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার লালসা প্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১৯)

অদর্শনে দুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি॥—(ঐ, পৃঃ ১২)
নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পূরে॥

যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥—(গীতরত্ন, ৭৫)
নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে ॥—(ঐ, পৃঃ ৩)
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে—(ঐ, পৃঃ ৮৭)
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩)

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা আর মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৭)
নয়নে নয়নে রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি
বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি ॥—(ঐ, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।—(ঐ, পৃঃ ১১৩)
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥[২৮]—(প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪ ;
রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭ ; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫)

চোখের নেশায় প্রেমের সূত্রপাত হইলেও, প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন। সেই জন্য যত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—যত দিন প্রেম "নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়" (গীতরত্ন, পৃঃ ৪) না হয়—তত দিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

২৮। এই গানটি ও নিম্নোদ্ধৃত তিন চারিটি গান গীতরত্নে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি নিধুবাবুর কি না সন্দেহ; কিন্তু বরাবর ইহা নিধুবাবুর নামের সহিত জড়িত; অন্য কাহারো বলিয়া যত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিধুবাবুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতরত্ন প্রামাণিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নহে। যেগুলি অন্য লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এরূপ সন্দেহযুক্ত গান মোট ৫টি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহ্যে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪)

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়—

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি॥—(ঐ, পৃঃ ৪০)
আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥-(ঐ, পৃঃ ৭)

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥—(ঐ, পৃঃ ১১৯)

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)
তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না॥—(ঐ, পৃঃ ৭৩)

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন॥—(ঐ, পৃঃ ২০)

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে যত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এই জন্য নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি　　দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্ত দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে।[২৯]

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥

২৯। পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য।

আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে॥—৩০ (গীতাবলী বা নিধু-
বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৩১ ; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৬)

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে
কখন না পাসরিব জীবনে মরণে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৯)
তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥—(ঐ, পৃঃ ১২৩)

প্রেম অনন্তগতি ; একবার ভালবাসিলে কখনও ভোলা যায় না—

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি হে দুখেতে॥—(ঐ, পৃঃ ২৮)
কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৯)
আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৯)
প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে। (ঐ পৃঃ ২৭)

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্ব্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে আছে যত অপমান॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥
(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৩০)

প্রেম—লজ্জা-ভয়, মান-অপমানের অতীত। যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে, চন্দ্রশেখর বাবু তাহা সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে

৩০। প্রীতিগীতিতে এই গানটি হরিমোহন রায়ের নামে আছে (পৃঃ ৫৩)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায়। এই গানটি নিধু বাবুর কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,[৩১]—"যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, তাঁহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই।......বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন্ ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার।
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে ॥
—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮)

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, *তাহার কি ঐকান্তিকতা! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক* আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।" সেই জন্য নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩)

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোদ্ধৃত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে ॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন-খঞ্জনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)

এরূপ চিত্রকুশলতার পরিচয় বিরল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥

৩১। প্রীতিগীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ৩৶৹।

যত ক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে ।—(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৭)

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

আদর—

স আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪১)

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে ।
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৬)

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে দুঃখের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর—(ঐ, পৃঃ ৭৭)

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে ।—(ঐ, পৃঃ ২)

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥—(ঐ, পৃঃ ১২০)

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটিয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ভুলিয়ে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)
এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥—(ঐ, পৃঃ ৬)

চক্ষের তৃষ্ণা মিটে না—

তিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন—(ঐ, পৃঃ ৫)

নয়নের জলে মনের অনল নিভে না—

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

হৃদয়ের আশাও কখন পুরে না—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো ॥—(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮৭৩; প্রীতিগীতি, পৃঃ ৩৭৬)

কিন্তু দুঃখ-যাতনা সত্ত্বেও কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজো না।
যদি রাত্র দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১৩১)

প্রেমের দহনে হৃদয় আরও নির্ম্মল হয়—

অন্য অন্য চিন্তা যত আমার আছিল
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুঃখের ভয়ে প্রেম ভুলিতে পারা যায় না—

থাকিতে বাসনা যার চন্দনবনে।
ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ করে কি কখনে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪৪)

প্রেমিকের কাছে প্রেমের দুঃখেও সুখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে গো রাখিতে।
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৭)

পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।—(ঐ, পৃঃ ৯৪)

প্রেমের এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকের আশ্বাস—

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব ॥—(বঙ্গের কবিতা, পৃঃ ২৯৫)

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধুবাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক। ইহাতে ভাবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি চন্দ্রশেখর বাবু ইহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়লালসার আধিক্য", "উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব" কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুর প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি ইঁহার কীর্ত্তিত প্রেমের "ইন্দ্রিয়লালসাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সমীচীন বলা যায় না।

আর একটি কথা। নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে হইবে; সেগুলি

শুদ্ধ কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাটীতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুর; সুরের ভিতর দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধু বাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধুবাবুর টপ্পায় কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়ও খাটে। সেই জন্য যাঁহারা রসজ্ঞ সুগায়ক কীর্ত্তনীয়ার মুখে মহাজন-পদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধুবাবুর টপ্পাও গান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে; তবে নিধুবাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মত গ্রন্থে নিধুবাবুর সার্দ্ধশতাধিক টপ্পার পুনর্ম্মুদ্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবি তাঁহার সময়েও এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" কিন্তু এত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধুবাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে, শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তন্মধ্যে একজন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি,—

> নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
> বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥
> কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
> ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৯৮)

শ্রীসুশীলকুমার দে

জঙ্গ-নামা*

"জঙ্গ-নামা" একখানি ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মমূলক কাব্য; ইহা মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ও বালিয়া পরগণার মধ্যস্থিত জৌরিকপুর গ্রাম-নিবাসী মুন্শী মোহম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম[১] ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ২২৩ বৎসর পূর্ব্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ 'ছন্দোবন্ধে' বীর ও করুণ রস-পূর্ণ এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জঙ্গ-নামার কবি, মুন্শী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০ বৎসর, সেই সময় তিনি এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, মুন্শী সাহেব বড়ই সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সাধু পুরুষদিগের দর্শন আশায় বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে এক দরবেশের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারই নিকট তিনি 'মুরিদ'[২] হয়েন[৩]। "জঙ্গ-নামার" মধ্যে তিনি ইহার পরিচয়ও দিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করিব।

হিজরীর প্রথম অব্দে, উমায়য়া-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং)[৪] প্রিয়তম দৌহিত্র, মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান(রা)কে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন, এবং মহাত্মা হজরত ইমাম হোসায়েন(রা)কে কারবালার যুদ্ধে

---

* "জঙ্গ-নামা" ফার্সী ভাষার দুইটি পৃথক্ শব্দ। জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ এবং নামা অর্থে বিবরণ বুঝায়। যে পুস্তকমধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হয়, তাহাকেই জঙ্গনামা বলে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে "জঙ্গ-নামা"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং বঙ্গদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট যে পুস্তকখানি জঙ্গনামা নামে পরিচিত, তাহা কারবালার ঘটনাবলীতে পূর্ণ। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যুদ্ধসংক্রান্ত অপর কোন পুস্তককে "জঙ্গনামা" বলেন না। "জঙ্গনামা" বলিলে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কেবল কারবালার যুদ্ধের বিবরণ-পুস্তকই বুঝিয়া থাকেন।

১। কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তাঁহার নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে, অতীব সম্মানের সহিত সে নাম উল্লেখ করিতে হয়। "মরহুম" সেই সম্মানসূচক শব্দ।

২। মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করার জন্ম সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাকে 'মুরিদ' হওয়া বলে।

৩। বসিরহাট, এবং সাতক্ষীরা মহকুমার কোন কোন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং) নাম উচ্চারণ করিয়াই "দরুদ-শরীফ" পাঠ করিতে হয়। 'দং' তাহারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

স-বংশে হত্যা করেন[১]। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিজ্‌রীর প্রথম অব্দে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এবং "জঙ্গ-নামা" ১১০১ বঙ্গাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবালার ঘটনার প্রায় ১১১১ বৎসর পরে এই "জঙ্গ-নামা" পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দশম হিজরী অব্দে, ফার্সী ভাষায় লিখিত অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেন" বিরচিত হইয়াছিল। "জঙ্গ-নামা"য় যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু এই "মোক্তাল-হোসেনে"র সহিত "জঙ্গ-নামা"র সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। "জঙ্গ-নামা"র কবি যে "মোক্তাল-হোসেনে"র কবির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; যথা,—

"তর্জ্জমা করিয়া আমি কবিতা গাথিনু।
মোক্তল হোসেন হ'তে এ কাব্য লিখিনু॥"

"জঙ্গ-নামা" কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি। কবি, ইহার প্রথম অংশে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দং) মোস্তাফার জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি হজরতের প্রিয়তম দুহিতা, বিবি ফাতেমা খাতুনে-জিন্নাতের ও বীরবর মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন[২]। হজরত আলি(কঃ)র ও হজরত

১। পার্থিব অধিকারের লালসায় ও ক্ষমতা-প্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায়, খলিফা এজীদ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসমধ্যে তাহা একান্তই বিরল। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মাবলম্বীই, আপনাদের পয়গম্বরের পরিবারবর্গ ও বংশধরদিগের উপর এই ভাবে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণাভাব। কোন কোন আরবী গ্রন্থকার বলেন, এই ঘটনার কিছু কাল পরে, খলিফা এজীদের হৃদয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগিয়াছিল, এবং তিনি মুক্তির আশায় ইমাম-পুত্র, হজরত জয়নাল আবেদীনের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন ভক্ত, খলিফা এজীদের পরকালে মঙ্গল হউক, সেরূপ কোন উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে নাকি নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে নিষেধ শুনেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা কাহার বংশধর, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি? ক্ষমা করা না করা যাঁহার হাত, তিনিই তাহা বুঝিবেন। আমি উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে বাধ্য।" তিনি খলিফাকে বলিয়াছিলেন,—"যদি তুমি উপর্য্যুপরি তিন বৎসর তিনটি "শবে-আশুরায়" বা-ওজু দুই রাকাত্ নকল নমাজ পড়িতে পার, এবং সেই ওজুতে পাপ-মুক্তির জন্য সারা-রাত্রি ধরিয়া খোদা-তায়ালার নিকট ক্রন্দন করিতে পার, তাহা হইলে হয় ত খোদা-তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন।" কিন্তু এজীদ মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।" কিছুতেই তিনি ওজু রক্ষা করিতে পারেন নাই। "ইবনে হাবিব" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের (দং) পিতৃব্য আবু-তালেবের পুত্র। বালকদিগের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে হজরত মোহাম্মদের (দং) প্রচারিত ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত

মোয়াবিয়া(রাঃ)র১ বংশ-পরিচয় ও ইঁহাদের জ্ঞাতি-বিরোধের মূল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইমাম ভ্রাতাদ্বয়ের কোন এক ঈদ্ পর্ব্বোপলক্ষে মাতামহের নিকট নূতন পোষাকের প্রার্থনা ও স্বর্গীয় দূত হজরত জাব্‌রাইল আমিন্২ উভয় ভ্রাতার জন্ম স্বর্গ হইতে দুইটি পোষাক লইয়া মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হওয়া, এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় যে ভাবে সেই পোষাক৩ গ্রহণ করেন, কবি তাহারও আলোচনা করিয়াছেন৪।

"জঙ্গনামা"র দ্বিতীয় অংশে, গ্রন্থকার যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এই বার আমরা তাহার একটু পরিচয় দিব। কবি মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, এই অংশে বলিয়াছেন যে, আবদুল জব্বর নামক এক ব্যক্তি আরবে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিবি জয়নাব। জয়নাব বিবি তৎকালীন আরব মহিলাদিগের মধ্যে পরমা সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কোন উপায়ে, মোয়াবিয়া-পুত্র এজীদ তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হয়েন, এবং জয়নাব বিবিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জয়নাব বিবির স্বামী বর্ত্তমান থাকায়, এজীদের এই ইচ্ছা

আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দুহিতা ফাতেমা বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, হজরত আলীর (কঃ) ঔরসে ও ফাতেমা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। উমায়্যাবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, হজরত মোয়াবিয়ার পুত্র। হজরত মোয়াবিয়া, হজরতের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন।

২। আমিন, স্বর্গীয় দূত জীব্‌রাইলের উপাধি। হজরত মোহাম্মদেরও এই উপাধি ছিল। খোদাতায়ালা জীব্‌রাইলকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং আরবের—মক্কার অধিবাসিবৃন্দ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন (হাদিস দ্রষ্টব্য)। আমিনের প্রকৃত অর্থ আমানত্‌দার। কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিলে, তিনি যদি তাহার সদ্ব্যবহার করেন, অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন অপ্রকাশ্য কথা বলিলে, তিনি যদি তাহা প্রকাশ না করেন, অথবা কোন ব্যক্তির মারফৎ কাহারও নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি যদি সে সংবাদ অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করেন, তবেই তিনি 'আমিন' উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন।

৩। ঐতিহাসিক "ইব্‌নে হাবিব" লিখিয়াছেন যে, তিনি সত্যবাদী ও সাহসী হজরত আব্দর রহমানের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, "হজরত বলিয়াছিলেন, এক দিন কোন এক ঈদ পর্ব্ব উপলক্ষে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় আমার নিকট নব বস্ত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয়কে নব বস্ত্র দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারায়, ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা তায়ালাকে তাহা জানাই। পরমুহূর্ত্তেই স্বর্গীয় দূত জীব্‌রাইল, একটি লাল ও একটি নীল বর্ণের পোষাক লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়েন। ভ্রাতৃদ্বয় এই পোষাক দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ইমাম হাসান নীল ও কনিষ্ঠ ইমাম হোসায়েন লাল বর্ণের পোষাক গ্রহণ করেন। জীব্‌রাইল ইহা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন যে, যখন আপনি, আপনার কন্যা, জামাতা, আবুবকর, উমর ও উস্‌মান, কেহই এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তখন মোয়াবিয়ার পুত্র এজীদ, জ্যেষ্ঠ ইমামকে বিষপ্রয়োগে, এবং কনিষ্ঠ ইমামকে কারবালার যুদ্ধে হত্যা করিবে।"

৪। "জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত এই অংশের সহিত ইতিহাসের মিল আছে। তবে একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে মাত্র।

কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়। পরন্তু জয়নাবের চিন্তাতে ক্রমেই এজীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে থাকে। পুত্রের শরীরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, এক দিন মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এজীদ পিতার নিকট জয়নাবের কথা প্রকাশ করেন। পুত্রের মুখে এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মোয়াবিয়া ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং এজীদকে সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ত আদেশ করেন। এজীদ মাতার[১] নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং ক্রন্দন করিয়া সকল কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করেন। এজীদের মাতা খলিফা মোয়াবিয়াকে এজীদের সহায়তার জন্ত অনুরোধ করেন, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, আমার একমাত্র পুত্র এজীদের[২] সহিত যদি আপনি যে কোন উপায়ে জয়নাবের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এজীদ নিশ্চয়ই প্রাণে মারা যাইবে। খলিফা মোয়াবিয়া স্ত্রীর কথায় এজীদকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন। স্থির হয় যে, এজীদ নিজেই নিজের সুবিধা

১। "জঙ্গ-নামা"র কবি পুস্তকের প্রথমাংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "যখন হজরত জীব্রাইল স্বর্গ হইতে পোষাক আনিয়া, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে দিয়াছিলেন, এবং উভয় ইমাম যথাক্রমে লাল ও নীল বর্ণের পোষাক মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, আর ইহার পর হজরত জীব্রাইলকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া, হজরত যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও হজরত জীবরাইল যখন যথার্থ কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, হজরত মোয়াবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনই বিবাহ করিবেন না। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এক দিন তিনি মূত্র ত্যাগের পর এক খণ্ড শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা 'কুলুফ' লইতেছিলেন, এবং সেই মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যে একটি বৃশ্চিক লুকায়িত ছিল; সেই বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করে। তিনি এই দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনয়ন করা হয়। চিকিৎসকেরা স্ত্রী-সঙ্গমই ইহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রভু হজরত মোহাম্মাদ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মোয়াবিয়ার আবাসে যাইতেছিলেন। পথে জীবরাইল তাঁহাকে বলেন যে, আপনি মোয়াবিয়ার বিপদ্মুক্তির জন্ত কোন প্রকার আশীর্ব্বাদ না করেন, ইহাই খোদাতায়ালার অভিপ্রায়। মোয়াবিয়াকে স্ত্রী-সহবাস করিতেই হইবে। প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দং) মোয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্ত্রী গ্রহণের জন্ত উপদেশ দান করেন। তখন মোয়াবিয়া বলেন যে, "আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এমন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সন্ধান করা হউক, যাহার সন্তান-সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ একটি বৃদ্ধাকে আনয়ন করিয়া, যথা-নিয়মে মোয়াবিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি খোদার মর্জ্জিতে এক পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতির আকার ধারণ করিয়াছে। সেই গর্ভে এজীদের জন্ম হয়।" কিন্তু ইতিহাস ইহার সত্যতা স্বীকার করে নাই। আল্ আমিন্ প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে, এজীদ এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন সমবয়স্ক ছিলেন। খালিফা আবুবকর সিদ্দিকের পুত্র আব্দর রহমানের আত্ম-জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বে, মোয়াবিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এই গল্পটির মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

২। আমির আলী প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকদিগের মতে এজীদ ব্যতীত মোয়াবিয়ার আরও সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমর্য়াবংশীয় তৃতীয় খালিফা এজীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি এজীদের ন্যায় ধর্ম্মদ্রোহী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুশাসন মান্ত করিয়া চলিতেন।

করিয়া লইবেন, খলিফা তাহাতে বাধা প্রদান করিবেন না। এই প্রকার পরামর্শ স্থির হওয়ায়, এজীদ আব্দুল্লা জব্বারকে, মোয়াবিয়ার নামের মোহরযুক্ত এক পত্র লিখেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, "তুমি পত্র পাঠ দামাস্কে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" আবদুল্লা জব্বার এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া, দামস্কে উপস্থিত হয়েন, এবং খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন। খলিফা আবদুল্লা জব্বারকে বলেন যে, আমার এক মাত্র কন্যাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি[১]। আবদুল্লা জব্বার, প্রথমে খলিফার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে যখন তাঁহাকে মিসর প্রভৃতি দেশ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবে বলিয়া খলিফা মত প্রকাশ করেন, এবং নগদ কিছু আশ্রফীও দেন, তখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আবদুল্লা জব্বার এই বিবাহে সম্মত হয়েন। বিবাহের দিন স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, আবদুল্লা জব্বার বরবেশে মজলিসে উপস্থিত হইলেন। কাজী মোল্লা আসিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। এজীদ 'বকিল'[২] হইলেন, দুই জন সাক্ষীও নির্দ্দিষ্ট হইল। এজীদ, এবং দুই জন সাক্ষী রাজকন্যার স্বীকারোক্তির জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "বিবি বলিতেছেন, 'আমি শুনিয়াছি, আবদুল্লা জব্বারের এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছেন। আবদুল্লা জব্বার যে, তাঁহার অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল-বাসিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যদি তিনি সেই স্ত্রীকে "তালাক" দিয়া আমাকে বিবাহ করেন, তবে আমি সম্মতি দান করিতে পারি।'" আবদুল্লা জব্বার ইহা শুনিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কিন্তু কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া, ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে, জয়নাবকে তালাক দিলেন। তালাকের পর, এজীদ এই সুসংবাদ লইয়া, সাক্ষিদ্বয় সমভিব্যাহারে ভগিনীর অনুমতির জন্য পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আমার ভগিনী আবদুল্লা জব্বারকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির লালসায় অমন রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যাকে অনায়াসে তালাক দিতে পারে, সে যে অপর কাহারও ধন-সম্পত্তির লালসায় আমাকে ত্যাগ করিবে না, যদি কখন আমার পিতা মিসরাদি দেশ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে যে তিনি আমাকে এই ভাবে ত্যাগ করিবেন না, তাহারই বা বিশ্বাস কি?" অগত্যা বিবাহ হইল না। আবদুল্লা জব্বার ক্ষোভে, দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। জয়নাব বিবি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে, এজীদের পক্ষ হইতে জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সেই লোকের সহিত আব্বাস নামক এক

১। মোয়াবিয়ার কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই। খলিফা মোয়াবিয়া, হজরত আলীর সহিত যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত তিনি জীবনে অপর কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনিই উমায়্যাবংশীয় খলিফাদিগের মধ্যে আদর্শ খলিফা ছিলেন। তাঁহার সময় ইউরোপের অনেক স্থানে মোস্লেম-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

২। বুকিল—উকিল। অধুনা সকলেই 'উকিল' উচ্চারণ করিয়া। কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'বুকিল'।

ব্যক্তির পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। আব্বাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রথমে এজীদের কথা বলিয়া, আমার কথা বলিও। বিবি যে উত্তর দেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা আমাকে শুনাইয়া যাইও।" দূত আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর জ্যেষ্ঠ ইমাম মহাত্মা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া শেষে আমার জন্য প্রস্তাব করিও। যদি তিনি সম্মত হয়েন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমাকে বলিয়া যাইও।" দূত যথাসময়ে জয়নাব বিবির নিকট উপস্থিত হইয়া পর পর তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া, ইমামকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। যথাসময় মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহ হইয়া গেল। এজীদ ইহা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। মোয়াবিয়ার মৃত্যু হইলে এজীদ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিলেন১।

জঙ্গ-নামার দ্বিতীয় অংশে আর একটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই,—"জয়নাব বিবির জন্য যে "এজীদ-ইমামে" ভীষণ মনান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা খলিফা মোয়াবিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে২, রোগশয্যায় শায়িত থাকার কালে, ইমামের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, "পূর্ব্ব-সন্ধি অনুসারে আমি তোমাকে মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের খলিফা মনোনীত করিতেছি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।" কিন্তু এই পত্র ইমামের নিকট পৌছে নাই। এজীদ কৌশল করিয়া এই পত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। খলিফা মোয়াবিয়া এই পত্র লিখার কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এবং এজীদ খলিফা হয়েন৩। খলিফা হইয়াই তিনি ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট ও অপরাপর অভিজাতবর্গের নিকট বশ্যতা স্বীকার

১। "জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত দ্বিতীয় অংশের এই গল্পটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। সমসাময়িক কোন ইতিহাসেই এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল "সোক্কল-হোসেন", "শাহাদাৎ-নামা", "মাতম-হোসেন", "সহীদে-কারবালা" প্রভৃতি কয়েকখানি ফার্সী কাব্যে এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইতিহাসে, ইমাম হাসানের জয়নাব নাম্নী এক স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বীরবর হজরত আলী(ক:)র জীবদ্দশায়, জয়নাব বিবির সহিত, ইমাম হাসানের বিবাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় জয়নাব বিবির সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এবং আততায়ীর হস্তে হজরত আলীর মৃত্যু হওয়ার পর এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। "জঙ্গ-নামা"য় উল্লিখিত হইয়াছে যে, "খেলাফৎ" লইয়া হজরৎ আলীর সহিত হজরত মোয়াবিয়ার যে যুদ্ধ হয়, তাহা পরে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সন্ধিপত্রে ইহা লিখিত হইয়াছিল যে, মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে ইমাম হাসানকে খালিফা মনোনীত করিবেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই।

৩। খালিফা মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে এজীদকে খালিফা মনোনীত করিয়াছিলেন। 'ইব্‌নে হাবিব,' 'আব্দর রহমান,' 'আল্‌ আমির' প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

করিয়া বয়েত১ হইবার জন্য পত্র লিখেন। অনেকেই সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন। কিন্তু ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় এজীদের হস্তে বয়েত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হয়েন। ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রকার আচরণে, এজীদ নিজেকে অপমানিত বলিয়া মনে করেন, এবং ছলে বলে কৌশলে ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ফলে, বিষপ্রয়োগে ও কারবালার যুদ্ধে ইমামদ্বয়কে নিহত করা হয়২।

"জঙ্গ-নামা"র তৃতীয় অংশে লিখিত হইয়াছে যে, কারবালার যুদ্ধের অবসান হইলে পর, যখন ইমাম হোসায়েনের পরিবারবর্গকে দামাস্কে সহরে লইয়া গিয়া, কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন আম্বাজের অধীশ্বর, মোহাম্মদ হানিফা নামক ইমামের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এজীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মোহাম্মদ হানিফাকে জয়মাল্য প্রদান করেন, এবং ইমামের পরিবারবর্গ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। জয়নাল আবেদীন৩ মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খেলাফতি করিতে থাকেন৪।

১। কোন ব্যক্তিকে পাথিব ও ধর্ম্মকার্য্যে শ্রেষ্ঠ জানিয়া, নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া, তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করতঃ তাঁহাকে উপদেষ্টা বা গুরু বলিয়া স্বীকার করা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাকে 'বয়েত' বলে। এজীদ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন না, এবং তিনি মহাপুরুষের শিক্ষা মত সাধারণ মুসলমান কর্ত্তৃক খালিফা নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। সুতরাং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার হস্তে বয়েত হওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

২। এই বয়েতের বিবরণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। এই বয়েতের ব্যাপার লইয়াই যে, কারবালার মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এজীদ দাম্ভিক ও ক্ষমতাপ্রয়াসী ছিলেন। আধিপত্য করাকেই তিনি অধিকতর পছন্দ করিতেন।

৩। মহাত্মা ইমাম হাসানের পুত্র। ইনি কারবালার যুদ্ধের সময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন নাই। ইহাঁরই বংশধরেরা পরে "ফাতে মাইদ খলিফা" নামে মিসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৪। "জঙ্গ-নামায়" আম্বাজ সহরের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি গল্প মাত্র। ইতিহাসে আম্বাজ সহরের কোনই নামোল্লেখ নাই। মহাত্মা হজরত আলী(কঃ), প্রভুকন্যা বিবি ফাতেমা খাতুনের জীবদ্দশায় অপর কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ফাতেমা বিবির মৃত্যুর পর, তিনি আব্বাসীয়াবংশীয় এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। সেই মহিলার গর্ভে একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ হানিফার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন তরবারি স্পর্শ করেন নাই। কেবল ধর্ম্মালোচনাতেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কারবালার যুদ্ধের পর, কয়েক জন ধর্ম্মপরায়ণ ও ইমাম-ভক্ত ব্যক্তি, এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন, এবং তাঁহারাই কারাগার হইতে ইমাম-পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জঙ্গ-নামা-প্রণেতা বলিয়াছেন, হানিফার মাতার নাম হনুফা বিবি ছিল। ইহা যে কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। জঙ্গ-নামায়, মোসেব কাক্কা, কাকা মোসেব, উম্বর আলী প্রভৃতি যে সকল বীর ও রাজন্যবর্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; ইতিহাসে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, জয়নাল আবেদীন যে কোন দিন খালিফা হইয়াছিলেন, তাহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

"জঙ্গ-নামা"র বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠকবর্গকে দিলাম, এবং তন্মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাও বলিলাম। এই বার আমরা "জঙ্গ-নামা"র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রচনার সন-তারিখ ইত্যাদি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

বটতলা, শিয়ালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে, মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, আমরা বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। "জঙ্গ-নামা" নামক কাব্যখানিও বটতলা প্রভৃতি স্থানের ছাপাখানায় ছাপা হয় ও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৩ কি ১৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা প্রথমে "জঙ্গ-নামা" কাব্যখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইয়া, একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম। ১৩২১ সালে যখন প্রথমে মুসলমানী সাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সর্ব্বপ্রথমে "জঙ্গ-নামা"র কথাই মনে পড়ে। তাই "জঙ্গ-নামা"র হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধানে, বঙ্গদেশের অনেক গ্রাম-পল্লী ভ্রমণ করি। অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিকে পত্রাদিও লিখি। যে স্থানে যে কোন প্রাচীন মুসলমানী পুথির সন্ধান পাইয়াছি, তথায় গমন করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছি। এই ভাবে অনেক অনুসন্ধানের পর, বর্দ্ধমান জেলার রাইগ্রামে, এবং খুল্না জেলার বাঁশদহ ও ইস্মাইলকাটী নামক গ্রামদ্বয়ে, জীর্ণ-দশাগ্রস্ত হস্তলিখিত তিনখানি "জঙ্গ-নামা" পুথির লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথি তিনখানি দেখিলে বোধ হয় উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তলিখিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহার একখানিতেও লিপিকরের নাম-ধাম ও লিপির সাল তারিখ লেখা নাই। রয়েল সাইজের আট-পেজ আকারের টুকরা টুকরা হস্তনির্ম্মিত তুলট কাগজে উহা লিখিত। পুথির পাতা মুসলমানী কায়দায় সাজান; দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। হস্তাক্ষর বেশ বড় বড়। এক একটি অক্ষর প্রায় ½ ইঞ্চি বড় হইবে। রাই গ্রামে যে পুথিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পত্রাঙ্ক ৩১০, ইস্মাইলকাটীতে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৮০ ও বাঁশদহ গ্রামে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৬০। তিনখানি পুথির বর্ণনাই একরূপ, কোন প্রকার পার্থক্য নাই, এবং এই পুথি তিনখানির হস্তাক্ষর পুরাতন ধরণের। এই তিনখানি পুথিরই শেষভাগে "সায়েরের পরিচয়" নামক একটি অংশ আছে, কিন্তু বটতলা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা"য় এ অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন্ সময় এবং কাহার কর্তৃক যে এই অংশটি প্রথমে পরিত্যক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, প্রথমে যে পুথির লিপি দৃষ্টে "জঙ্গ-নামা"র মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই পুথি হইতে কোন ক্রমে বোধ হয় এই অংশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই হইতে এই "সায়েরের পরিচয়" অংশটি বাদ পড়িয়া আসিতেছে। আমরা, এই পুথি তিনখানির সহিত, মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা" মিলাইয়া পাঠ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিশ্বাস, কেবল প্রুফ দেখার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সায়েরের পরিচয়টি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছি।

"সায়েরের পরিচয়।"

"জঙ্গ-নামার কথা ভাই সহদের সার।
খাদেম[১] ইয়াকুব ভণে পরিচয় তার॥
বালিয়া মোকাম ভাই জীরিকপুরে ঘর।
বাপের নাম শাহ ছন্দি[২] দাদা মোজাফ্‌ফার॥
মুর্শিদ[৩] বড়ে-খাঁ গাজী, মুরিদ[৪] আমি তাঁর।
প্রথম দিদার[৫] পাইনু, জঙ্গল মাঝার॥
চারি সহদর মোরা ভগিনী তিন জন।
পহেলা[৬] সন্তান পিতার এই অভাজন॥
হামিদ শফিক আর নসিম ও করিম।
বহিন্[৭] সাবেরা আর হাজেরা মরিয়ম॥
আপনার জনেরা সব যে যেখানে আছে।
আর যত আসিতেছে এ সকলের পাছে॥
দোওয়া[৮] সবে কর ভাই যত মমিনান্[৯]।
এহি আর্জ্জি[১০] পেশ[১১] করে অধম ও নাদান্[১২]॥
বাঙ্গালার এগার শত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমা বার[১৩] সময় ফজর[১৪]॥
আল্লার মেহেরে[১৫] আর নবিজীর তোফেলে[১৬]।
"জঙ্গ-নামা" সায় হ'ল ইয়াকুবেতে বলে॥
আল্লা আল্লা বল রে ভাই দিন ব'য়ে যায়॥
নাদান্ ইয়াকুব আলী সবাকারে কয়॥"

এই "সায়েরের পরিচয়" হইতে আমরা কবির নাম, তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম,

---

১। সেবক।

২। বসিরহাট অঞ্চলে শাহছন্দি নামক ফকিরের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কবি ইয়াকুব আলির পিতা কি না, তাহা জানা যায় না।

৩। গুরু, মুক্তির পথ-প্রদর্শক।

৪। মুরিদ—শিষ্য, ভক্ত।

৫। দিদার পাইনু—দর্শন লাভ করিনু।

৬। পহেলা—প্রথম।

৭। বহিন্—ভগ্নী।

৮। দোওয়া—আশীর্ব্বাদ।

৯। মমিনান্—ঈমানদার মুসলমানগণ, ধার্ম্মিক মুসলমান সকল।

১০। আর্জ্জি—দরখাস্ত, বর্ণনা-পত্র।

১১। পেশ—সম্মুখে উপস্থিত করাকে 'পেশ' করা বলে।

১২। নাদান্—নির্ব্বোধ, বোকা।

১৩। জুমা বার—শুক্রবার।

১৪। ফজর—প্রাতঃকাল।

১৫। আল্লার মেহেরে—আল্লার অনুগ্রহে।

১৬। নবিজীর তোফেলে—পয়গম্বর সাহেবের সু-দৃষ্টির ফলে।

এবং ভ্রাতা ভগিনীগণের নাম জানিতে পারিলাম। আর জানিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বসিরহাট মহকুমার বালিয়া পরগণা, এবং সেই পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেইখানে বাড়ী-ঘর ছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম১।

গ্রন্থকার প্রথমেই ঈশ্বর-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পহেলা বন্দিনু আল্লা পাক্-করতার।"

[অর্থাৎ "আমি এক, মহান্ ও পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে বন্দনা করিয়া, এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিতেছি।"] গ্রন্থকার তাহার পরই লিখিয়াছেন,—

'দ্বিতীয় বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাঁহার॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"দুতিয়া বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাহার॥"

[অর্থাৎ সেই মহান্, পবিত্র, অনাদি ও অনন্ত আল্লাহ্ তায়ালার দূতদিগের বন্দনা করিতেছি।] গ্রন্থকার ইহার পরই কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূতের নাম করিয়াছেন। যথা,--

"জীব্রাইল্, মিকাইল্, আর ইস্রাফিল্।
সালাম করিয়া বন্দিনু আজরাইল্॥
আর যত ফেরেশ্‌তারা আছেন আল্লার।
একে একে সবাকারে সালাম আমার॥"

গ্রন্থকার, তৃতীয় বন্দনা করিয়াছেন,—সমস্ত নবী, রসুল, পয়গাম্বর ও স্বর্গীয় গ্রন্থের। যথা,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে নবী ও রসুল যত পেনু॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে রসুল বন্দিনু যত পাইনু॥"

এই ভাবে বন্দনা সমাপ্ত করিয়া, কবি বলিয়াছেন,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা২ মোর হয়।
মেহের৩ করিয়া মাফ৪ করিবে সবায়॥

১। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, কবিবর ইয়াকুব আলী বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশেও কেহ জীবিত নাই বলিয়া শুনা যায়। কবিবরের পিতৃবংশের কেহ জীবিত আছেন কি না, তাহার সন্ধান করা হইতেছে।

২। খাতা—অপরাধ, ত্রুটি। ৩। মেহের—অনুগ্রহ, দয়া। ৪। মাফ্—মার্জ্জনা, ক্ষমা।

রচনার ঝুঁট[১] সাচ্চা[২] আমি নাহি জানি।
আসল কেতাব যাঁর জানেন যে তিনি[৩] ॥

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায় ॥
রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি ঠেকি।
কেতাব যেমন আছে তাহা আমি লিখি ॥"

গ্রন্থকার আর এক স্থানে ইমাম-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"ইমামের পদ আশে,
ফকির ইয়াকুব ভাসে,
　　যেই শুনে ইমামের মওত[৪]।
নরক আজাব[৫] তার,
কদাচ হবে না আর,
　　বেহেশ্‌ত পা'বে, শাহীদী মওত[৬] ॥"

কবিবর, গ্রন্থের আরও কয়েক স্থানে তাঁহার মুর্শিদ ও পিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত্[৭]।
বড়েখান্ গাজী যারে দিল মোলাকাত[৮] ॥

*　　*　　*　　*

"বড়ে খাঁ গাজীর পায়,　　অধীন ফকির কয়,
　　কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহ বড়েখান্ গাজী,　　নেক্‌কামে[৯] রহে রাজী[১০],
　　মেহের-নজরে[১১] তাকাইয়া ॥"

১। ঝুঁট—মিথ্যা।　　২। সাচ্চা—সত্য।

৩। এই স্থানেই কবিবর বোধ হয়, "মোক্তল হোসেনে"র গ্রন্থকারকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন।

৪। মওত—মৃত্যু।　　৫। আজাব—যন্ত্রণা।

৬। শহীদী মওত—ধর্ম্মযুদ্ধে কিম্বা কোন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, তাহাকে "শহীদী" মৃত্যু বলে। এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বর্গবাসী হইবে। কোন প্রকার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। হজরত ইমাম হোসায়েন শহীদ্ হইয়াছিলেন। যিনি স্থিরচিত্তে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, তিনিও শহীদী সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। কবিবরের বোধ হয়, ইহাই বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য।

৭। কেতাবের-বাত—কেতাবের কথা।　　৮। মোলাকাত—দর্শন।

৯। নেক কামে—মঙ্গল কার্য্যে, ধর্ম্ম কার্য্যে, উত্তম কার্য্যে।　　১০। রাজী—সন্তুষ্ট।

১১। মেহের নজর—সু-দৃষ্টি।

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়েখান্ গাজীর পায়, অধীন্ ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহে বড়খান্ গাজী, নেক্‌কামে রহে রাজী,
মেহের নজরে তাকাইয়া॥"

* * * *

"বাপ নাম শাহ-ভুন্দি আল্লার ফকির১।
ভাটিয়া সোল্‌তান্ গাজী বড়ে খাঁ২ পীর॥"

* * * *

১। বোধ হয়, ফকিরের পিতাও একজন দরবেশ ছিলেন। আরও অনেক স্থানে এই ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এই বড়ে খান্ গাজী যে কে তাহা আজিও জানা যায় নাই। কিংবদন্তীতে এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গাধিপতি শাহ সেকান্দারের এক পুত্রের নাম মোহাম্মাদ গাজী। তিনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। উত্তরকালে তিনিই "বড়ে খান্ গাজী" নামে বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। একজন "বড়ে খান্ গাজী" বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পীর বলিয়া পরিচিত। বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গের ভাটী মুল্লুকে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। শুনা যায়, আজিও নাকি 'বাদা' অঞ্চলে "বড়ে খান্ গাজীর" দোহাই দিলে, ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও এই জাগ্রত পীরের আস্তানার নির্দ্দেশ হয় নাই।

গোবরডাঙ্গার নিকট, চাঁরঘাট নামক গ্রামে, মরা-যমুনা-তীরে, এক পীরের আস্তানা আছে। তাঁহার নাম শাহ ঠাকুরবর। পীরের সেবায়েৎদিগের নিকট শাহী আমলের যে সকল কাগজ-পত্র আছে, আমরা অনেক বার তাহা দেখিতে চাহিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা আজিও আমাদিগকে সে সকল কাগজ-পত্র দেখান নাই। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, শাহ ঠাকুরবর, মহারাজ মুকুটেশ্বরের পুত্র। গাজী সাহেবের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শাহ ঠাকুরবরের ভগ্নী চম্পাবতীর সহিত গাজী সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, কিংবদন্তীতে প্রকাশ। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় "মাইচাম্পার দরগা" আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেখানেও কিংবদন্তীতে নাকি এইরূপ প্রকাশ যে, তিনি বড়ে খাঁ গাজী বা গাজী সাহেবের স্ত্রী। সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা "জঙ্গ-নামা"র অপরাপর অংশের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাবিচারের দিন, প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ), তাঁহার কন্যা মহামাননীয়া হজরত বিবি ফাতেমাতোজ্ জোহরা ও জামাতা বীরবর মহাত্মা হজরত আলী, এবং দৌহিত্রদ্বয়—মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, সমস্ত পাপীদিগকে উদ্ধার করিবেন। সকলকে সঙ্গে না লইয়া ইঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন না। খোদা তায়ালার নিকট ইঁহারা বলিবেন, "আলী ও ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের রক্তের বিনিময়ে, আমরা পাপীদিগকে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। যদি সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়, এ সম্বন্ধে এক পৃথক্ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বড়ে খাঁ ভাবিয়া দেলে[১],
অধীন ফকির বলে,
শাহ-ছন্দির পহেলা করজন্দ[২]।
কহেন বড়ে খাঁ গাজী
লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে সেই, যার যেমন নিবন্ধ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়খান্ ভাবিয়া দেলে, অধীন ফকির বলে,
সাহা ছন্দির পহেলা করজন্দ।
কহেন বড়খান্ গাজী, লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে জার যেমন নিবন্ধ॥"

জঙ্গ-নামার কবি যে, এজীদ-ইমামের বিরোধের বংশগত কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহা কবির ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

"পহেলার বাত কহি শুন ভাই যত।
এজীদ ইমাম বৈরী হ'ল যেই মত॥
চারি পুরুষ আগেতে আব্দুল মন্নাফ।
জমজ দু-বেটা তারে দিল বারী আপ্॥
হইল সে দুই বেটা পিঠে পিঠে জোড়া।
বহুত খেঁচিল[৩] পিঠ না হইল ছাড়া॥
আবদুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল শমশের[৪] খেঁচি পিঠের উপরে॥
দুই জন জুদা[৫] হইল হুকুমে আল্লার।
হাশেম একের নাম শুনহ খবর॥
উম্মিয়া[৬] দুয়ের নাম বড়ই আকিল[৭]।
দুহুরে ওস্তাদ হৈল বড়া খোস দিল্॥
হাশেম, উম্মিয়া দোন জাঁহাবাজ[৮] হৈল।
দু-জনে ঝগড়া আর কাটাকাটি ছিল॥

১। দেলে—অন্তরে। ২। করজন্দ—সন্তান। ৩। খেঁচিল—আকর্ষণ করিল, টানিল।
৪। শমশের—তরবারী, তলওয়ার। ৫। জুদা—পৃথক্।
৬। ইঁহারই বংশধরেরা উমায়্যা বংশীয় কোরেশ নামে খ্যাত। উমায়্যা বংশীয় খালিফারা ইঁহারই বংশধর।
৭। আকিল—বুদ্ধিমান্। ৮। জাঁহাবাজ—কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন চালাক ব্যক্তিকে জাঁহাবাজ বলে।

হাশেমের বেটা ছিল আব্দুল মোতালিব।
বড়া নেক মর্দ্দ[১] ছিল আল্লার হবিব[২] ॥
উম্মিয়ার বেটা ছিল নামেতে হরব।
বড়া ধড়িবাজ ছিল আপনা গরজ ॥
মোতালিব হরবে জঙ্গ রাত দিন ছিল।
মোতালিবের বেটা আবু তালেব হইল ॥
হরবের বেটা হইল সুফিয়ান নাম।
আবু তালেবের সঙ্গে ঝগড়া মোদাম[৩] ॥
আবু তালেবের বেটা আলী জোরওয়ার[৪]।
সুফিয়ানের বেটা মোয়াবিয়া ইয়ার[৫] ॥
আলী আর মোয়াবিয়া ইয়ার দুজনে।
দোহেতে[৬] ঝগড়া ছিল পুসিদা[৭] বাতুনে[৮] ॥
রসুলের দাবে[৯] কেহ জাহের করিয়া।
না করিত ঝগড়া যে ছিল চুপ হৈয়া ॥
আলীর ফরজন্দ হৈল হাসান, হোসেন।
মোয়াবিয়ার বেটা হৈল এজীদ কমিন্ ॥
সেল্‌সেলা আইল এ্যায়সা ঝগড়া হইয়া।
ইমাম এজীদে জঙ্গ ইহার লাগিয়া ॥”

কিন্তু বটতলার পুস্তকে আছে,—

“এজীদ এমামে দোন ঝগড়ার বাত।
পহেলার বাত কহি হইল জ্যায়সা ভাত ॥
চারি পুরুষ আগে ছিল আবদুল্লা মন্নাফ।
জমক দু'বেটা তার দেখিলেন্ আপ্ ॥
* * * *
আব্দুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল সমসের তার পিঠের উপরে ॥” ইত্যাদি।

“জঙ্গ-নামা”র কবি, ইমাম-এজীদে বিরোধের স্ত্রীলোক-ঘটিত যে কারণের উল্লেখ

১। নেক-মর্দ্দ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। ২। হবিব—প্রিয়, বন্ধু।
৩। মোদাম—সর্ব্বদাই, সকল সময়। ৪। জোরওয়ার—বলবান্, শক্তিশালী।
৫। ইয়ার—সহচর, পার্শ্বচর। ৬। দোহেতে—দুজনাতে, দুই জনে। ৭। পুশিদা—গুপ্তভাবে।
৮। বাতুনে—লুকান অবস্থায়। ৯। রসুলের দাবে—রসুলের ভয়ে।

করিয়াছেন, কবির ভাষায় তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। খলিফা মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তুমি বটে বেটা মোর এক জাহানেতে[১]।
তুমি বিনা বেটা বেটী নাহি দুনিয়াতে॥
যে কিছু মনের কথা কহনা আমারে।
হাসেল[২] করিয়া দিব আল্লা যদি করে॥"

উত্তরে এজীদ বলিতেছেন,—

" * * * * *
আলম্পানা[৩] সালামত[৪] কহি যনাবেতে[৫]॥
মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে আমি কহি যদি জীউ-আম্মা[৬] পাই॥
জব্বারের বিবি[৭] জয়নাব তার নাম্।
অতিশয় গুণবতী রূপে অনুপম্॥
এক রোজ তাহাকে যে দেখিয়া নজরে।
ছটফট করে জীউ নাহি রহে ধড়ে॥
শয়নে আরাম নাই ক্ষুধা নাই পেটে।
না দেখিয়া বিবিকে যে জীউ মোর ফাটে॥
তাহাকে করিতে নিকাহ্[৮] মোর সাধ্।
তোমার হুকুম[৯] হইলে, নহে পরমাদ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে যদি কহি আগে জীউ-আম্মা পাই॥
জব্বরের কবিলা জয়নাব তার নাম।
অতিশয় রূপবতী গুণে অনুপাম॥" ইত্যাদি।

১। জাহানেতে—পৃথিবীতে, দুনিয়ায়। ২। হাসেল—সম্পূর্ণ, ইচ্ছা পূর্ণ।
৩। আলম্পানা—পৃথিবীর রক্ষক। ৪। সালামত—স্থায়ী হউক।
৫। যনাবেতে—হুজুরের নিকট। ৬। জীউ-আম্মা—প্রাণ ভিক্ষা।
৭। বিবি—স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, সুন্দরী, ধর্ম্মপরায়ণা।
৮। নিকাহ্—বিবাহের ফার্সী নাম 'নিকাহ'। আরবী ভাষায় বিবাহকে 'আকদ' বলে। বিধবা অথবা তালাকী স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহকে যাঁহারা 'নিকাহ' ও কুমারী কন্যা বা যুবতীর সহিত বিবাহকে যাঁহারা বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ৯। হুকুম—আদেশ, অনুমতি।

খলিফা মোয়াবিয়ার আহ্বানে, আবদুল্লা জব্বার দামাস্কে উপস্থিত হইলে, খলিফা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কবির ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"বলিল তোমাকে আমি ডাকি এথাতিরে১ ।
মোর এক বেটী আছে সুঁপিব২ তোমারে ॥
দেহাজ করিব৩ তুঝে মেসের সহর ।
এক লাখ. দিব তুঝে৪ সোণার মোহর ॥"

এজীদের কৌশলে ও প্রলোভনে আবদুল্লা জব্বার সম্মত হইলেন। বিবাহের সময়, এজীদ 'বকিল'-বেশে ভগিনীর সম্মতি আনয়ন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"কহিতে লাগিল আসি সভার হুজুরে ।
কবুল না কৈল বিবি আব্দুল্লা জব্বারে ॥
বিবি বলে শুনিয়াছি এই সমাচার ।
পরম সুন্দরী বিবি ঘরে আছে তার ॥
হেন রূপবতী ছেড়ে সে কেন আমারে ।
মোহাব্বাত৫ করিবেক দেলের৬ ভিতরে ॥
যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি ।
তবে ত কবুল আমি করিব সেতাবী৭ ॥"

তালাকের পর এজীদ পুনরায় যাহা বলিলেন, কবি এই ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

* * * *

ঝড়ি এক বাদে আসি আবদুল্লাকে বলে ॥
না করে কবুল তুঝে৮ শুনহ জব্বার ।
এই কথা শুনি বিবি হইল বেজার৯ ॥
মক্কারা বলিয়া তুঝে১০ বিবি যে কহিল ।
মাল মুল্লুকের লোভে জয়নাবে ছাড়িল ॥
বেলাত মেসের, শাম পাইয়া আমারে ।
লায়েক আওরত১১ যে ছাড়িয়া নেকা করে ॥

১। এথাতিরে—এ জন্য, এ কারণ। ২। সুঁপিব—সমর্পণ করিব, তোমার সহিত বিবাহ দিব।
৩। দেহাজ করিব—যৌতুক দিব। ৪। তুঝে—তোমাকে।
৫। মোহাব্বাত—প্রণয়ের ভালবাসা। ৬। দেলের—অন্তরের, হৃদয়ের।
৭। সেতাবী—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে। ৮। তুঝে—তোমাকে। ৯। বেজার—অসন্তোষ, দুঃখিত।
১০। তুঝে—তোমাকে। ১১। আওরত—স্ত্রীলোক, পত্নী।

কদাচিত যদি বাবা মুল্লুক ছাড়ায়।
এসাই[১] তালাক দিয়া ছাড়িবে আমায়॥
এমন মক্কারা লোকে কেবা কোথা চায়।
শুনিয়া তামাম[২] লোক করে হায় হায়॥"

এজীদের দুত যখন জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে আব্বাস নামক এক জন ভদ্রলোকের সহিত দুতের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে, আব্বাস দুতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আব্বাস কহিল তবে করি মেহেরবাণী।
আমার পয়গাম[৩] লিয়া জাহনা আপনি॥
এজীদের খবর আগে কহিয়া বিবিকে।
পশ্চাতে খবর মোর কহিবে তাঁহাকে॥"

দুতপ্রবর মুসা আসারী আব্বাসের নিকট বিদায় লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং হাসান দুতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"কত দুর গিয়া দেখা ইমামের সাথে।
হাসান্ নরমে বাত লাগিল পুছিতে॥
অনেক দিন পরে দেখা হইল মুসা ভাই।
কোথায় চলিয়াছ তুমি খুসিতে এসাই॥

ইহা শুনিয়া দুত সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, এবং মহাত্মা হাসান্ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—

"শুনিয়া হাসান্ শাহ লাগিল কহিতে।
কহিবে পয়গাম মোর তাহার পিছেতে॥

এজীদ খলিফা হইয়া, মোস্লেম-সাম্রাজ্যের সকল প্রধানগণকে যে আদেশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, "জঙ্গ-নামা"র কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"মুল্লুকে মুল্লুকে দিল ভেজিয়া পরওয়ানা[৪]।
আমি এবে হইনু বাদশা পাঠাও খাজানা॥
সকল মুল্লুকের বাদশা ডরে ডরাইয়া।
খাজানা ও নজরাণা সবে দিলেক ভেজিয়া॥

১। এসাই—এই প্রকার। ২. তামাম—সমস্ত,
৩। পয়গাম—সম্বন্ধ। ৪। পরওয়ানা—সংবাদ, বিজ্ঞাপন, আদেশ।

মদিনা সহরেও এক লিখিল ফরমান[১]।
লেখা নাহি যায় সেই না-ফরমানীর[২] বয়ান্॥
লিখিল হাসান শাহে আর ইমাম হোসেনে।
আব্দুল্লা উম্বর আর আব্দুল রহমানে॥
লিখিল লিখনে এইরূপ হকিকত শক্ত।
মাবিয়ার মৃত্যু হইল মিলিল মোরে তক্ত॥
সকল মুল্লুক এখন হইল যে আমার।
বয়েত হৈল মোর হাতে সাহেব সর্দ্দার॥
এবে এই লিখন যে লিখি তোমা বরাবর।
বাদশাই হুকুমকে দেলে জান মাতব্বর[৩]॥
আসিয়া এবে আমার সাতে করহ সাক্ষাৎ।
না আসিলে যে ফল পাইবে জানিবে পশ্চাৎ॥
যে জনা নাহিক আমার হইবে অনুগত।
মোর ক্রোধে হবে সেই বড়ই লাঞ্ছিত॥
তক্তের[৪] উপরে বাদশা হৈয়াছি আমি।
এবে দুই ভাই মুঝে দেহ যে সালামী॥
এবে মেরা নামে খোতবা পড়হ দুই ভাই।
মক্কা ও মদিনা লইয়া করহ বাদ্শাই॥"

এই পত্র যথাসময় মদিনায় পৌঁছিলে, মদিনার প্রধানগণ পত্র পাঠ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন :

'ভাল'ত কমজাত[৫] হেন পাইল বাদ্শাই।
আমাদের উপরে লিখে লিখন এ্যায়সাই।
আব্দুল্লা-উমর বলে গোশ্বা দিল হইয়া।
এজীদ কমজাত বুঝিবা শরাব[৬] খাইয়া॥
আমাদের নিকটেতে লিখে এমন লিখন।
শুনিয়া বলেন তবে ইমাম ও হোসায়েন॥
এতেক যে দেমাগ্ হইল লেউণ্ডি[৭] ছাচ্চার।
এমন লিখন লিখে সেহ নাহি করি ডর॥

১। ফরমান—আদেশ-পত্র, হুকুমনামা।

২। না-ফরমানী—প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করিলে না-ফরমানী বলে।

৩। মাতব্বর—শ্রেষ্ঠ, বড়। ৪। তখ্তের—রাজসিংহাসনের। ৫। কম্জাত—নীচবংশজাত।

৬। শরাব—সুরা, মদ। ৭। লেউণ্ডি—বাঁদি।

এত বলি মদিনাবাসী সকলে ডাকিয়া।
শুনাইলেন সবাকারে লিখন পড়িয়া ॥
হোসায়েন বলেন তবে শুন ভাই সব।
মালুম করিলে সবে এজীদা মতলব ॥
নানা যে মোর নুর নবী হবিব খোদার।
আলী শাহা বাপ মোর দুনিয়া সরদার ॥
মোয়াবিয়ার বেটা যে এজীদ তার নাম।
আউওল আখের মোর নানার১ গোলাম ॥
কম্‌জাত মোদেরে আজি ভেজিল লিখন।
ইহার মস্‌লত আমি করিব কেমন ?
কি প্রকারে থাকিব মোরা এজীদের তাবে ?
বিবেচনা করি তোমরা কহ ভাই সবে॥
জোড় হস্তে কহেন সবে শুনহে ইমাম।
বিচার নাহিক কোথা সাহেব ও গোলাম ?
আপনি যাবেন সেথা হইয়া তাবেদার।
তোমাদের হুজুরেতে এজীদ কোন ছার ?
বাপ যার খেদ্‌মতে২ আছিল হামেহাল৩।
তোমাকে খেদ্‌মতে চাহে তাহার ছাওয়াল ?
জেনা-কার৪ হারামজাদা সেই ত মাতাল।
পাইলে তাহারে মোরা চড়ায়ে ভাজি গাল্‌ ॥"

এজীদের ষড়্‌যন্ত্রে যখন মহাত্মা ইমাম হাসান্‌ জলের সহিত হীরকচূর্ণ পান করিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া হোসায়েনকে ডাকিতে বলিলেন, কবি সেই সময়ের যে করুণ রসের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গকে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি।

"শুন রে কাসেম আলী, সেতাবি৫ জাহনা চলি
হোসেনকে আনহ ডাকিয়া।
ভাইকে বলিবে তবে, হাসেন বিদায় হবে,
কেয়ামত৬ সফর৭ লাগিয়া ॥
কান্দিয়া কাসেম চলে, ভিজিল আঁখির জলে
শুনিয়া বাপের এই কথা।

১। নানার—মাতামহের, দাদামহাশয়ের।
২। খেদ্‌মত—সেবা, আজ্ঞা পালন।
৩। হামেহাল—সদাসর্ব্বদা।
৪। জেনাকার—পরদারগমনকারীকে 'জেনাকার' বলে।
৫। সেতাবি—শীঘ্র।
৬। কেয়ামত—মহাবিচারের দিন।
৭। সফর—বিদেশ গমন, স্থানান্তরে গমন।

শোকেতে ফাটিল ছাতি, যেন কাঁকুড়ের ভাতি,
আইল হোসেন রহে যেথা ॥
হোসেন কাসেমে দেখে, মন্দা-মন্দা১ হাসি মুখে,
ভাতিজাকে২ করেন মস্কারি।
সবক৩ পড়িতে বুঝি, করিয়াছ দাগাবাজী,৪
বেজার৫ করেছে চড় মারি?
হাত দিয়া ছাতি পরে, কাসেম আরোজ৬ করে,
চাচা৭ জান্ শুন মেরা বাত।
ইমাম-হাসান-আলী, সফর করিবে বলি,
বিদায় হইবে তেরা সাথ ॥
দু-আঁখি হয়েছে লাল, মুখেতে ভাঙ্গিছে লাল,
কহিলেন ভায়ে আন গিয়া।
দেখ আসি চাচা মেরা, এতীম৮ হইনু মোরা,
বাবাজান্ চলিল ছাড়িয়া ॥
হোসেন এ কথা শুনে, আসিলেন ততক্ষণে,
সের-পাঁও৯ নাঙ্গা১০ যে করিয়া।
দেখেন ভায়ের তরে, হেঁট-সেরে১১ কয় করে,
কলেজা ছেদিছে বিষ গিয়া ॥
দেখিয়া হোসেন শাহা, মুখে বলে আহা আহা,
হায় হায় করে খাড়া১২ হৈয়া।
কহে শুন ভাই-জান, জহর কে দিল কন্,
কহ দেই সের উড়াইয়া ॥
হাসান কহেন শুন, খোদার হুকুম মান,
তাহার কলম১৩ এই মত।
কবুল১৪ করহ ভাই, তবে কিছু সমঝাই১৫
শুটিকত বুঝে নসিহত১৬ ॥

১। মন্দা-মন্দা—মৃদু মৃদু। ২। ভাতিজা—ভ্রাতুষ্পুত্র। ৩। সবক—পাঠ।
৪। দাগাবাজী—প্রবঞ্চনা। ৫। বেজার—দুঃখ দেওয়া, অসন্তোষ করা।
৬। আরোজ—প্রার্থনা, নিবেদন। ৭। চাচা—পিতৃব্য, পিতার ভ্রাতা।
৮। এতীম—পিতৃহীন। ৯। সের-পাঁও—আপাদ মস্তক। ১০। নাঙ্গা—অনাবৃত।
১১। হেঁট-সেরে—নত মস্তকে। ১২। খাড়া—দাঁড়ান। ১৩। কলম—অদৃষ্টের লেখা।
১৪। কবুল—স্বীকার। ১৫। সমঝাই—বুঝাই। ১৬। নসিহত—উপদেশ।

পিইতে১ জহর২ মোরে, যে জন দিলেন তারে,
কিছু না বলিবে ভাই তুমি।
খোদার করম পর, চারা নাই বেরাদর,
কার পরে দিব দোষ আমি ?
কহি বাত্ তার পরে, মেরা লাড়কার৩ তরে,
মেহের৪ যে করিবে জেয়াদা৫।
আপনা ছাওালে হেন, পেয়ার৬ করিবা জান,
কদাচিত না বুঝিবা জুদা৭ ॥
যাহার মা-বাপ আছে, জাইয়া তাহার কাছে,
আফ্‌সোসের৮ দম নাহি ফেলে।
থাকিলে আমার বাপ, পিয়ার করিত আপ্‌
হেন যেন কভু নাহি বলে ॥
হুসেন কহিযে ভাই, শুনহ মেহের হই,
দফন করিবে যেই ভিতে।
নবীর রওজা৯ টেরে, দমন করিবে মোরে,
এই বাত রাখিবে যে চিতে ॥
গোর দিয়া মোর তরে, কহিবে যে নানাজীরে,
যেন সে রহম করে নবী।
গোরের বরকত মোরে, যেন তিনি আতা করে১০,
তবে মেরা মউতের খুবি ॥
দোস্ত১১ দুশ্‌মনের১২ সাথে, না থাকিবে আদাওতে১৩
সবাকার নেকুই১৪ চাহিবে।
বেটা বেটী আওলিয়া, গরীব এতীম হৈয়া,
দুনিয়াতে আপনি থাকিবে ॥
কদ্‌বানু১৫ যে জহর, দিল মোরে বেরাদর,
কিছু না বলিবে তরেতার।

১। পিইতে—পান করিতে। ২। জহর—বিষ। ৩। লাড়কা—পুত্র।
৪। মেহের—অনুগ্রহ। ৫। জেয়াদা—অধিক। ৬। পেয়ার—স্নেহ।
৭। জুদা—পৃথক্। ৮। আফসোষ—আক্ষেপ।
৯। রওজা—পয়গম্বর, নবী, রসুল ও সিদ্ধপুরুষদিগের কবরের নাম রওজা।
১০। আতা করা—দান করা। ১১। দোস্ত—মিত্র, সুহৃদ্। ১২। দুশ্‌মন—শত্রু।
১৩। আদাওয়াৎ—বিরোধ। ১৪। নেকুই—মঙ্গল। ১৫। কদ্‌বানু—মহাত্মা হাসানের ভার্য্যা।

দুশমনের হিকমতে১, জহর দিয়াছে পিতে,
কিছু দোষ না আছে তাহার ॥
কান্দিয়া হাসান বলে, বারেক আইস কোলে,
বিদায় হইনু তোমা হৈতে।
হোসেন শুনিয়া শোকে, গলে গলে মুখে মুখে,
ধরি দোন লাগিল কান্দিতে ॥
এগানা২ জতেক আর, সাত'শ মহিলা আর,
কান্দিয়া করেন সবে সোর।
নাহি জানি কোন চারা, যেমন পাগল পারা,
সবে বলে কি হইল মোর ॥
ইমাম হাসান তবে, দেখিয়া লাড়কা সবে,
কান্দিয়া হইল জার জার৩।
আঁখেতে৪ পড়িছে পাণি, ডাকিছে মধুর বাণী,
আইস কোলে করি একবার ॥
ইলাহির চাহা হৈলে, আর না করিব কোলে,
আইস জাই মিটাইয়া সাধ।
এত বলি শিশুগণে, কোলে করি জনে জনে,
কাঁদে ইমাম ভাবিয়া বিষাদ ॥"

কারবালার ময়দানে কয়েক দিন জল অভাবে যখন হোসায়নের ছয় মাসের শিশু পুত্র মরণাপন্ন হইল, তখন সহরবানু প্রভৃতি তাঁবুর মধ্যে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহাত্মা হোসায়েন তাঁবুর বাহিরে ছিলেন। তিনি ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পত্নী সহর বানুকে কহিলেন,—

"সহর বানুকে বলে গোশ্বা দেল হইয়া।
সোর-সার৫ বল এই কিসের লাগিয়া ॥
বিবি কহেন গোশ্বা৬ তুমি হইলে কেমনে।
কলেজা শুখায়ে জায় সবার পাণি বিনে ॥
স্তন্ হইতে দুধ মোর গেল শুখাইয়া।
ছাওয়াল আজেজ৭ হৈল দুধ না পাইয়া ॥
থোড়াই যে আনিয়া পাণি দাও এই বেলা।
বারেক যে পিইয়া পাণি তর করি গলা ॥

১। হেকমতে—শঠতায়। ২। এগানা—আত্মীয়।
৩। জারজার—আকুল ও ব্যাকুল। ৪। আঁখেতে—চক্ষে। ৫। সোর-সার—গোলমাল।
৬। গোশ্বা—রাগ, ক্রোধ। ৭। আজেজ—অস্থির।

হোসায়েন কহেন সব মোনাফেক১ গণ।
চাহিলেও আমাকে পানি না দিবে কখন॥
এত দিন কেহ মোরে মোনাফেক হইতে।
দেখিয়াছ কি কোন চিজ্ কখন চাহিতে?
কুফর কম্‌জাত্ পানি দিবে যে আমারে।
এত্‌বার২ কাহার কথায় হৈল তোমারে॥
বিবি কহেন যেরূপে আনিতে পার পানি।
না আনিলে পেয়ারা৩ মোর মরিবে এখনি॥
কান্দিয়া যে কহেন বিবি ইমামের পায়।
পানি বিনা আমার ছাওয়াল মারা যায়॥
এক বিন্দু পানি বিনা ছাওয়াল হয় খুন্।
হায় হায় মারা যায় যে মোর প্রাণধন॥"

ইহা শুনিয়া, মহাত্মা হোসায়েন সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, অশ্বারোহণে এজীদ-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"শুন রে কাফের সব বেহায়া অধম।
কিছু নাহি কর মনে আখের শরম॥
খোদাকে পছন্দ নহে কহিযে তোমায়।
আখেরে খারাব হবে নাহি কিছু ভয়?
আলীর ফরজন্দ ও রসুলের নাতি।
ফতেমা আমার মাতা জান খুব ভাতি॥
খোদিজা, আয়েশা, সোলেমা মোর নানি৪।
তা সবার মুখ চাহি দেহ খোড়া৫ পানি॥
গোনা৬ যদি হৈয়া থাকে আমার হইতে।
আমাকে না দেহ পানি শুন কহি ইতে॥
না করিল গুণা খাতা লাড়কা আমার।
খোড়া পানি দেহ ভাই ওয়াস্তে খোদার॥
দুধের ছাওাল মোর হারায় পরাণ।
মেহের৭ করিয়া তার জীউ দেহ দান॥
বে-গুণা সকলে কেন মার শুখাইয়া।
আখেরে পুছিবে আল্লা ইহার লাগিয়া॥
কাফের সকলে কহে শুন হে ইমাম।
তুমি যে হোসেন মোরা চিনিনু তামাম॥
যে দিন তোমার কাছে করিব চাকরী।
সে দিন করিব মোরা তেয়া তাঁবেদারী॥৮

১। মোনাফেক—অবিশ্বাসী, ধর্ম্মে আস্থাহীন।   ২। এত্‌বার—বিশ্বাস, প্রত্যয়।
৩। পেয়ারা—প্রিয়।   ৪। নানি—মাতামহী।   ৫। খোড়া—অল্প।
৬। গোনা—অপরাধ, পাপ।   ৭। মেহের—অনুগ্রহ।   ৮। তাবেদারী—আজ্ঞাপালন।

আজি তেরা বাত মোরা নাহিক শুনিব।
হৈলে আজেজ কাতরা পানি নাহি দিব॥"

ইহা বলিয়া এজীদের সৈন্যগণ মহাত্মা হোসায়েনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শুনিয়া কাফের গিধি গোস্বায় অস্থির।
হোসেনের পরে খেঁচে মারিলেক তির।
হোসেনের কোলেতে যে ছাওাল আছিল।
হোসেনে না লাগি তির ছাওালে লাগিল॥"

তীর শিশুর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; শিশু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর হোসেন—পুত্র-শোকাতুর হোসেন—সেই মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও শিশুর গর্ভধারিণীকে কহিলেন,—

"মোর্দ্দার ছাওালে লিয়া ফিরিয়া আইল।
সহর বাহুর কোলে ছাওয়ালেরে দিল॥
কহেন ভেস্তের১ পানি আমি খাওাইয়া।
আনিনু ছাওালে এই আসুদা২ করিয়া॥"

কিন্তু বটতলায় ছাপা জঙ্গ-নামায় লিম্নলিখিতরূপ আছে, যথা—

"মোর্দ্দার ছাওয়াল নিয়া ফিরিয়া আইল।
শহর-বানু৩ কোলে ছাওয়াল এনে দিল॥
কহেন ভেস্তের পানি আমি খাওয়াইয়া।
আনিনু ছাওয়াল এই আসুদা করিয়া॥"

অতঃপর কারবালা প্রান্তরে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা ইমাম হোসায়েনের আব্দল ওহাব নামক জনৈক পার্শ্বচর করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "এজীদ-সৈন্য নদীর জল বন্ধ করিয়াছে; জলের অভাবে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। আপনি আদেশ করুন, আমি শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে জল লইয়া আসিতেছি।" মহাত্মা ইমাম তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন, তিনি শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া প্রথমে কহিলেন,—

"রসুল-আওলাদ মরে না-হক্৪ পানি বিনে।
আখেরেতে খারাব হ'বে কেয়ামতের দিনে॥
আখেরের৫ ভালাই যদি চাহ রে কমজাত।
পানির পথ যে ছাড়ি দেহ কহিতেছি বাত॥"

বটতলায় ছাপা পুস্তকে প্রথম দুইটি পদ নিম্নলিখিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ দুইটি পদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। যথা—

১। ভেস্ত অশুদ্ধ কথা, 'বেহেশ্ত' শুদ্ধ। ২। আসুদা—প্রাণায়াম।
৩। শহর-বানু—ইমাম হোসায়েনের স্ত্রী। ৪। না-হক্—অনর্থক। ৫। আখেরের—পরকালের।

"রসুল আওলাদ মরে নাহিক পানি বিনে।
আখেরে খারাব হবে হেসাবের দিনে॥"

এজীদ-সৈন্য আব্দল ওহাবের এই উক্তির মৌখিক কোন উত্তর দিল না; তরবারির দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু বহুসংখ্যক এজীদ-সৈন্য, ওহাবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অবশেষে আব্দল ওহাব নিহত হইলেন। আব্দল ওহাবের পর ইমামের আরও কয়েক জন আত্মীয় ও পার্শ্বচর একে একে যুদ্ধে গমন করিলেন এবং সকলেই নিহত হইলেন। জঙ্গ-নামার কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"এইরূপে ছিলেন যতেক পাহাল্‌ওয়ান্।
শাহীদ হইলেন সবে আল্লার ফরমান্॥
ইমাম হোসায়েন তখন ডাহিন বামেতে।
দেখিতে লাগিল শাহা চাহি চারি ওরফেতে॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে, যথা—

"এইরূপে আছিল যতেক পাহাল্‌ওান্।
সহীদ্ হইল দেখ আল্লার ফরমান্॥
আমির হোসেন তবে ডাইন বামেতে।
নজর করিয়া শাহা লাগেন কহিতে॥"

মহাত্মা হোসায়েনের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, হাসান্-পুত্র মোহাম্মদ কাসেম১ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "চাচা! অনুমতি করুন, এই বার আমি যুদ্ধে যাইব।" কাসেম যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কাসেমের মৃত্যুর পর, মহাত্মা হোসায়েনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আকবর২ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আলী আকবরের পর, হোসায়েনের অপর দুই পুত্র, আলী আস্‌গর ও আবদুল্লা আকবর একে একে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন৩। জীবিত রহিলেন কেবল জয়নাল আবেদিন্৪।

অবশেষে মহাত্মা হোসায়েনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জঙ্গ-নামার কবি এই সময় হোসায়েনের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ইবনে হাবিব বলেন, এই সময় কাসেমের বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর ছিল।

২। আলী আকবরের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

৩। আলী আস্‌গরের বয়স ১৩ ও আবদুল্লা আকবরের বয়স ১২ বৎসর ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। জয়নাল আবেদিন এই সময় রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে গমন করিতে পারেন নাই।

"কেবল যাইয়া শাহা ময়দানে খাড়া হয়।
দেখিয়া যে বেইমান্ সবে হজিমত খায়১ ॥
হাকিল যে হয়দারী-হাঁক২ ভাবিয়া খোদায়।
ঝন্-ঝনা পড়িল যেন কুফরের মাথায় ॥
কত জন পলাইয়া বাঁচে লস্করের মাঝে।
ভয়ে কম্পবান্ হয় সবে হাঁকের আওয়াজে ॥
হোসায়েন কহেন আছ কোন্ পাহালওয়ান।
যদি মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ান্৩ ॥"

হোসায়েনের আহ্বানে এজীদ-সৈন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রথমে একে একে যুদ্ধ করিয়া যখন বিশেষ কোন সুফল প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা এক ব্যূহ রচনা করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। কবি এই সময়ের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"চুনিন্দা সিপাহী আর যতেক সরদার।
কাটিয়া হোসায়েন শাহা করে সার-খার৪ ॥
পালায় কাফের সবায় কেহ নাহি টিকে।
আইল বলিয়া কেহ পশ্চাতে নাহি তাকে ॥"

এজীদের সকল সৈন্যই কেহ নিহত, কেহ আহত হইল; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। তখন মহাত্মা হোসায়েন, ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া জল পানার্থ নদীতে অবতরণ করিলেন। অঞ্জলি পুরিয়া জল তুলিলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের শোকে সে জল পান করিলেন না, ফেলিয়া দিলেন। তখন শত্রুসৈন্য সুযোগ বুঝিয়া প্রথমে দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। হোসায়েন নদী-গর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া একে একে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন; ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। শিমর নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিল। ইহার পর মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধের কথা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অনৈতিহাসিক।

বটতলার ছাপাখানাওয়ালাদিগের কল্যাণে যে "জঙ্গনামা" কাব্যখানি কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলাম না। পৃথক্ প্রবন্ধে তুলনায় সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কেহ ইচ্ছা করিলে বটতলার ছাপা জঙ্গনামার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। হজিমত খায়—ত্রাসিত হয়।

২। হজরত আলী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেন। শত্রুসৈন্য এই শব্দ শ্রবণ করিয়া থরহরি কম্পিত হইত। হজরত আলীর অপর নাম হয়দার। সে কারণ এই শব্দের নাম হয়দারী।

৩। আগুয়ান—অগ্রসর। সার্-খার—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের ষষ্ঠ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ ১৩০৫) "বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে[১] পাওয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।[২] এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্শমান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward* or *A History of the Serampur Mission*, 2 vols. London. 1859. vol II p. 161 ; Letter from J. C. Marshman to Dr. George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen*, 1898. pp. 230-33 ; *Calcutta Review*. XIII (1850), Art. "*Early Bengal Language & Literature* ; *ibid* CXXIV. (1907), pp. 391-93 ; Smith, *Life of William Carey*. London 1885, New Ed 1912 ; E Carey, *Memoir of William Carey*. London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সকল দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ায় এ সমস্ত মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এমন কি, মার্শমান সাহেব স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission*, Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে (*History of Bengal*. 1859 p. 251) ২৯শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখদ্বয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Ben. Lang. & Lit.* 1911. p. 877) মার্শমান সাহেবের শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস গ্রন্থধৃত তারিখ যথাযথ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় (*Descriptive Catalogue*. 1855. r. 66) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ধৃত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিয়াছে ১৮১৯।

Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।[৩] সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।[৪] কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল[৫]। এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত বক্তৃতা[৬] হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সন্দর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।—

"সমাচারদর্পণ।

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক[৮] [প্রকা]শ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক [মা]স ২ ছাপাইবার কল্প ও ছিল তা[হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ সাহেবের নিকট জে সি মার্শম্যানের পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission*, Vol II, p 167 ; Marshman, *History of Bengal*. p. 251 ; *Cal. Rev.* 1850, Vol XIII ; Smith, *Life of Carey* ; *Friend of India*. 1850, Sep. 19 ; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু রেভারেণ্ড লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুষ্কাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উদ্ধৃত অংশটির মূল অত্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত স্থানগুলির যে স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্যান্য স্থলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২০৬) যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগ্দর্শন বা যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ ; Digdarsan or the Indian Youth's Magazine. ইহা বাঙ্গলায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্দেশীয় | [লো]কেরদের নিকটে সকল প্রকার | [বি]দ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে | [সক]লের সম্মতি হইল না এই | [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা | [হইত] তবে কাহারো উপকার | [হইত] না অতএব তাহার পরী|[বর্ত্তে] এই সমাচারের পত্র ছা|[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে। | [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ।—|

[এই স]মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে | ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে | [এই এই স]মাচার দেওয়া যাইবে। |

[১ এতদ্দেশে]র জজ ও কলেক্টর[৯] | [ ]র ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্য|[ক্ষেরদের] নিয়োগ।—|

[৪ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে ২ | [নুতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি | [প্রকাশ করিবে]ন। |

[৩ ইংলণ্ড] ও ইউরোপের অন্য ২ | [প্রদেশ হইতে] যে যে নুতন সমাচার | [আইসে এবং] এই দেশের নানা | [সমাচার] |

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ। |　　　　[এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত]

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ | ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। |

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্ত্তৃক | যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই | সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে | এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ | ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই | সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প | ও কল প্রভৃতির বিবরণ[৯] থাকে | তাহাও ছাপান যাইবে। |

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি|হাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক | ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ। |

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে | প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে | তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। | প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের | পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।[১০] | ইহাতে যে লোকের বাসনা হই|বেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের | ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা|হে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে। |"

প্রথম দুই সংখ্যায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল।—

১ম সংখ্যা।—

পৃঃ ১—১। সমাচারদর্পণ (২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

২। মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার (পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত)

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬) উদ্ধৃত অংশে এই স্থলে ভুল আছে।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার" আছে,—"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে।" অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার"—"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যত ১।০ দেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১।০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক।" তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২, বার টাকা।

পৃঃ ২—১। প্রথম স্তম্ভ অত্যন্ত খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে "রাজকর্ম্মে নিয়োগ" শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

ওলাউঠা

যুবরাজের কন্যার মরণ (পৃঃ ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরকপুর পৌছান খবর (heading নাই)

বাণিজ্যের সমাচার (২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপদ্বীপের ঝড়

মান্দরাজ (৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—(কয়েক লাইন খণ্ডিত)

ইংগ্লণ্ডে নূতন কল

সর্প কর্ত্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ (পৃঃ ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয় —হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ (৩য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত)

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) "ইস্তাহার" আছে—"এই সমাচারে[র পত্র] অতি ত্বরায় ছাপা হইল সে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃঃ ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

বাদশাহের জন্মদিন

নাগপুরের রাজার বিবরণ

পেশোয়া

পৃঃ ২।—(১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না।)

চোড়িগড় অধিকার

২৩ আফরেল

বাণিজ্য

মরীচি উপদ্বীপ

উত্তর আমেরিকা

পৃঃ ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

অশ্রুত সমাচার

বিবাহের নূতন ব্যবস্থা

ইংগ্লণ্ডের রাজকীয় ব্যায়

তৃতীয় স্তম্ভ খণ্ডিত—গৌড় নগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ

পৃঃ ৪। প্রথম স্তম্ভ একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গৌড় সম্বন্ধে প্রবন্ধের তিন স্তম্ভ-ব্যাপী অনুবৃত্তি

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সম্বন্ধে ইস্তাহার। (বর্ত্তমান প্রবন্ধের ১০ ফুটনোটে উদ্ধৃত)

সমাচারদর্পণের আকার ১৩″ × ৯॥″। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা (৪ জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫) হইতে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইত—"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানীহ[11] জানন্ত সমাচারস্ত দর্পণে॥" ৬৪ সংখ্যা (৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হইবে,—"সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সম্বাদপত্র।"[12] ১৮২১ পর্য্যন্ত যে ফাইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন স্তম্ভে বিভক্ত। ১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আমূল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা (৮ আগষ্ট ১৮১৮) হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "সেরিফ সেল" বা "জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার" কখনও এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন স্তম্ভ দেওয়া হইত। ২০ মার্চ্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের প্রারম্ভেও অন্যান্য জমীর নিলামের ইস্তাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার আর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যাইত। কখন কখন এই ইস্তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত (৫২ সংখ্যা, ১৫ মে ১৮১৯)। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "বাজার ভাও"র তালিকা দৃষ্ট হইবে; ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে দর, বালাম চাল ১॥৴০; "উত্তম গায়ে ঘৃত" ২০৲; মধ্যম ঐ ১৬৲; ভৈঁসা ঘৃত ১৮৲; মধ্যম ভৈঁসা ১৫৲; নীল উত্তম ১৬০৲, অন্যপ্রকার নীল ১১০৲; কাশীর চিনি ১০৲, মধ্যম ৮।৷০ ইত্যাদি। (১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯। ৪ পৌষ, ১২২৬)।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সম্বন্ধে। মধ্যে মধ্যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ইহার দুএকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮ (১১ শ্রাবণ, ১২২৫) সংখ্যায় পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান (শব্দসিন্ধু) সম্বন্ধে এইরূপ ইস্তাহার পাওয়া যায়,—"এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়াননারীর

১১। "বৃত্তান্তানিহ" হইবে। এই ভুল ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৫, পৃঃ ২৫১) "সর্ব্বহিতপ্রয়োজক" উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মূলানুযায়ী নহে।

ন্যায় দেশীয় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ[ ] রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ]য় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা [ ] তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।" ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৩]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের (১৮ই আশ্বিন, ১২২৫) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—"নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জ্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" লং সাহেবের তালিকায় ও তদনুকরণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার তারিখ খ্রীঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে ; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে ভুল প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন[১৪] ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয় ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নহে ; বরং ইংরাজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত ; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ (১১ আশ্বিন, ১২২৫) হইতে—

"কলিকাতায় নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১৩। শব্দসিন্ধু গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ জানা যায়—"গগন গণেশভুজ গন্ধর্ব্বভূমিতে। গ্রন্থসমাপ্তির শাক জানিবে পণ্ডিতে।" পুনশ্চ পৃঃ ৪৮৮—"অভ্রগ্রন্থ্যম্বভূমিঃ পরিগতগণনে শাক ঈদৃগ্‌দ্বিজাতিঃ শ্রীযুৎপীতাম্বরাখ্যো বুধগণভিতঃ পুস্তকঃ নিষ্পাপাৎ" ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্রে (title-page) "কলিকাতায় ছাপা হইল ১২২৪ সাল" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮১৭।১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে (পৃঃ ৯০১) ইহার ভুল তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১২) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুকরণে ১৮০৯ দেওয়া হইয়াছে।

১৪। *History of Beng. Lang. & Lit.* 1911. p. 902.

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।"

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত? অথবা জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal)?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।"

১৩ই মার্চ্চ, ১৮১৯ (১লা চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৩ সংখ্যা হইতে—

"কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।[১৫]

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত যত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।"

২০শে মার্চ্চ, ১৮১৯ (৮ই চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরে সাহেব

১৫। স্কুল সোসাইটী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ প্রথম স্থাপিত।

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।"

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ (২২শে চৈত্র, ১২২৫) ৪৬ সংখ্যা হইতে—

"পুস্তক ছাপান।

* * * *

এইক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান[১৬] করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কন চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিদোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে নাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।"

২৯শে মে, ১৮১৯ (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

"স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়েটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় কর (sic) গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ[১৭] সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয়

১৬। শব্দকল্পদ্রুম। (*see Second Report of the Cal. School Book. Society* 1819, p. 50)

১৭। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্দ্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন প্রতিনিধিকে ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার রীতি শিক্ষা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিল। (Long's *Introduction to Adam's Reports*: Lushington, *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity.* Cal. pp. 145-155)। ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যথা—"উপদেশ কথা (ইতিহাসের সুবচন) পরন্তু ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক কলিকাতা ১৮২০" ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।"

পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যায় (৫ই জুন, ১৮১৯। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) পুনশ্চ—

"স্কুল সোসৈয়েটী।

•কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ও পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে[১৮] তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।"

উক্ত সংখ্যায় পুনশ্চ—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষার কেহ তর্জ্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

১৮। এ বিষয়ে Long, *Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal*, London, 1868 দ্রষ্টব্য।

তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা" (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী" নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা[১৯] ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১৯ (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লীয় (*sic*) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।"

১৯শে জুন, ১৮১৯ (৬ই আষাঢ়, ১২২৩) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

"জগন্নাথমঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথমঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালিগান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে

১৯। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলা। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia. Vol I. Anatomy. ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ফিলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এনসেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। পরিঃ উলিয়াম কেরী কর্ত্তৃক তর্জ্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০। or The Science of Anatomy translated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britanica by F. Carey. Assisted by Sreekanta Vidyalankar & Shree Kavichandra Tarkasiromani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820." শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (*History of Beng. Lang. & Lit.* p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে "Hadavali Vidya" (হাড়াবলী বিদ্যা) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় "হারাবলী" স্থানে "হাড়াবলী" হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিদ্যা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অর্থে ভ্রমক্রমে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবধান অমার্জ্জনীয়। কারণ, পুস্তকের titlepage এ এবং যে যে স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্ব্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে ধরিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ; প্রবন্ধান্তরে ইহার সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ হইতে উপরোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব ছিল। ফিলিক্স (Felix) বৃদ্ধ উইলিয়াম কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বাঙ্গালা ভিন্ন পালী ও ব্রহ্মদেশের ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ইহার মৃত্যু হয়। (*Bengal Obituary*, p 350)

জগন্নাথদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।"

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬) ৮১ সংখ্যা হইতে—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

ইহার পূর্ব্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ (১৩ই পৌষ, ১২২৫) ৩২ সংখ্যা হইতে—

"সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

সহমরণ সম্বন্ধে আন্দোলন তখন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহমরণের সংবাদ অন্যান্য সংবাদের ন্যায় সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতিবিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"

সহমরণ-বিধির সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ (৩রা আশ্বিন, ১২২৬) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি-প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।"

স্কুল সোসায়েটীর উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসায়েটীর উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ (৬ই কার্ত্তিক, ১২২৭) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ আক্টোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।[২০] শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার[২১] কথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমিদের কথাক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।"

মেণ্ডিস্ (Mendies) সাহেবের[২২] অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জানুয়ারী, ১৮২১ (১৬ই মাঘ, ১২২৭) ১৪১ সংখ্যায় ইস্তাহার,—

২০। উক্ত সোসায়েটীর রিপোর্ট (*First Report of the School Book Society*. Cal. 1818. p. 61) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর হাজার টাকা নহে, ৫০০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ বাৎসরিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতেন।

২১। ইনি মে, ১৮০১ খৃঃ অব্দে ফোর্টউইলিয়াম কালেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেড্ মুন্সী নিযুক্ত হন, (Roebuck, *Annals of the Fort William College*. 1819. App III. p 48)। উক্ত কলেজের ডাক্তার গিলক্রিষ্ট (Gilchrist) সাহেব যে ঈসপস্ ফেবলের ছয় ভাষায় (হিন্দুস্থানী, পারসী, আরবী, ব্রজভাষা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে (Roman Character) মুদ্রিত করেন, তাহার বাঙ্গালা অংশের অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য তারিণীচরণ মিত্র করেন [Preface to *Oriental Fabulist* 1803 by Dr Gilchrist ; Buchanan, *College of Fort William* 1805 p. 221]। উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে গিলক্রিষ্ট সাহেব তারিণী বাবুর অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটীর রিপোর্ট (১৮১৮, পৃঃ ৯) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ছিলেন (Native Secretary), কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—"An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors, & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822."

"ইস্তাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মেণ্ডিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পহুঁছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।"[২৩]

[এই ইস্তাহার পরবর্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ ৩১শে মার্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যায় দেখা যায়,—

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব[২৪] ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা

২৩। ১৬৭ সংখ্যায় (৭ই জুলাই, ১৮২১। ২৫ শে আষাঢ়, ১২২৮) মেণ্ডিস সাহেব তাঁহার গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছেন যে, সমুদয় কেতাব বাঙ্গালায় তর্জমা করা সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। "মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্য্যন্ত এক শত বিশ পেজ ছাপা হইয়াছে এই অনুসারে অবশিষ্ট তাবৎ সমাপ্ত হইলে তাঁহারদের নিকট পাঠান যাইবেক।"

২৪। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সংকলন করেন নাই, পরন্তু ফেলিক্স কেরী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থান ভিন্ন অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary.* Cal. 1857. p 349; Wenger, *Story of the Lallbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800.* Cal. 1908. Appendix.

মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

২রা জুন, ১৮২১ (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮) ১৫৯ সংখ্যায় "মুগ্ধবোধকৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ" সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠাব্যাপি দীর্ঘ ইস্তাহার। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। শেষে "শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ কলিকাতা শিমুল্যা" এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য আছে,—"এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান্।" পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬ টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়েটী হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাঙ্গালা বর্ণমালা[২৫] সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১৬৩ সংখ্যা। ৩০শে জুন, ১৮২১। ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮),—

"নূতন পুস্তক।

এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও নকার ও বকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্‌কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে। এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি [সম্রা]জ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত [ ] যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমাচার। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। ইহার এক খণ্ড পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে।

কোম্পানির কাগজের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানির হিসাব, ইংগ্লণ্ডের বাদসাহ বা তৎপরিবারের খবর, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের মফঃস্বল পর্য্যটন (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপমৃত্যু, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ঝড়, ভূমিকম্প, মাহেশের রথ, লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) মৃত্যু (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (৭শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। দুএকটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও২৬ জানা যায়,—

"গ্রীষ্ম কোর্টের শেষ সিছিলের সময় যখন কর্ম্ম সমাপন করিয়া গ্রাণ্ডজুরি বিদায় পাইল তখন তাহারা শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট পুলিসের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন গলিজ ছিল যে তাহার দুর্গন্ধেতে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিসের সাহেবেরা অন্য অন্য কর্ম্মে থাকিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।" (১৬ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্ত্তিক, ১২২৫)

পুনশ্চ— "কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক অনেক গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।" ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)

নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে,—

"মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।" (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭)।

দুএকটা আজগুবি খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। যথা,—

আশ্চর্য্য চক্ষুলাভ।

ইংগ্লণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্য্যগ্রহণে অসভ্য লোকেরদিগের বিবর গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বামচক্ষুহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে

২৬। এই সংবাদ সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্রেও যথেষ্ট পাওয়া যায় (Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, Cal. 1888, p. 157)।

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাৎ সেই বামচক্ষুতে অকস্মাৎ দৃষ্টি হইয়া দুই চক্ষু সমান দৃষ্টি হইল।" ইত্যাদি (২৪শে মার্চ্চ, ১৮২১। ১২ই চৈত্র, ১২২৭)

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার। ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বা শাসনসম্বন্ধীয় সংবাদও থাকিত। এই সকল বিবরণ হইতে দেশের তদানীন্তন ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি গড়িয়া লওয়া যায়। পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধ, হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, মোগল বাদশাহের ও লাহোরের রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও সুতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না।[২৭] বর্ত্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে; সুতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে দুএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব।

"বোনাপার্ট।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেণ্ট হেলিনা নামে উপদ্বীপে রুদ্ধ করিল সেখান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যখন বোনাপার্ট শুনিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার মাতামহ তাহাকে ঈশ্বরারাধনার অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অদ্যাপি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই সে উপদ্বীপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের শুভাশুভ সমাচার দিনের মধ্যে দুই বার যায় এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিনা বাহির হইতে পারে না।" ইত্যাদি (২০শে জুন, ১৮১৮। ৭ই আষাঢ়, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে মুক্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু যদ্যপি বোনাপার্টকে মুক্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দেয় তথাপি তাহা হইবে না।" (২৯শে আগষ্ট, ১৮১৮। ১৪ই ভাদ্র, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

সান্ত হেলেনা দ্বীপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেতে বোনাপার্ট গ্রহণি পীড়াতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন।" (১০ই অক্টোবর, ১৮১৮। ২৮ই আশ্বিন ১২২৫)

২৭। এই সকল সমাচার আলোচনা করিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লেখা যায়।

"বোনাপার্ট।

মোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগষ্টের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা বোনাপার্তকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের জিম্বাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে নূতন সেনাপতিরদের জিম্বা করিয়াছিল তাহারদের পরীবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নূতন সেনাপতিরদের জিম্বাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কর্ম্ম দেখিতে পাই।" (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯। ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমাচার বা মন্তব্য ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

১। নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)
　পেশোয়া (ঐ)
　চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)
২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)
　সোলাপুর (ঐ)
৩। চান্দাগড় (১০ জুন)
　সুনরগড়দিগর দখল (ঐ)
　রইগড় (ঐ)
　নাগপুরের রাজা (ঐ)
　পেশোয়া (ঐ)
৪। বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ (২০ জুন)
　হসিংহবাদ (ঐ)
৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া (২৭ জুন)
　রণজিৎ সিংহ (ঐ)
　বাজিরাও (ঐ)
৯। [সিন্ধিয়া সম্বন্ধে—মূল খণ্ডিত] ২৫ জুলাই
১০। শ্রীত্রিম্বকজী দাংলিয়া (৮ আগষ্ট)
　লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)
১১। গত যুদ্ধের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ
　শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)
১২। গত সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধবিবরণের] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদনপত্র (ঐ)

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র (ঐ)

১৩। শ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা (৫ সেপ্টেম্বর)—পূর্ব্বানুবৃত্তি

নর্ম্মদাতীরস্থ দেশের সমাচার [ঐ]

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ঐ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা—পূর্ব্বানুবৃত্তি (১২ সেপ্টেম্বর)

১৫। ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ (১৯ সেপ্টেম্বর)

১৬। কর্ণাটিক নবাবের কর্জ্জের বিষয় (২৬ সেপ্টেম্বর)

১৭। প্রিন্সেস চার্লেট আফ ওএল্‌স (৩ অক্টোবর)

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া (ঐ)

নাগপুর (ঐ)

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর (১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর)

১৯। পশ্চিম দেশের [মহারাষ্ট্র] সমাচার (দীর্ঘ প্রবন্ধ) (২১ সেপ্টেম্বর)

গড় কোটা (ঐ)

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার (৫ ডিসেম্বর)

ওআহবিরদের বিষয় (ঐ)

২১। যুদ্ধের সমাচার (২৬ ডিসেম্বর)

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাণিজ্য (২০ জুন)

বেলুন (ঐ)

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় (ঐ)

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা (২৭ জুন)

৩। বর্ম্মার দেশ (৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯)

৪। স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ (১৮ জুলাই)

৫। পৃথিবী ও তাহার সন্তান (২৫ জুলাই)

৬। তর্পিদো কল বিষয় (১৫ আগষ্ট)

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ (২২ আগষ্ট)

৮। গ্রীনলণ্ডীয়েরদের ধর্ম্ম (১০ অক্টোবর)

৯। দিল্লীর লুট [নাদেরশার আক্রমণ—"ডো সাহেবের" পুস্তক হইতে] (১৭ অক্টোবর)

১০। শাহ আলম বাদশাহ (৭ নভেম্বর)

১১। গোঙ্গা ও বধিরের পাঠশালা (২৮ নভেম্বর)

১২। ডৈঅজিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য (ঐ)

১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১২ ডিসেম্বর)

১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিক্রয় (১৯ ডিসেম্বর)

এই সকল সন্দর্ভাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে "ইতিহাস"[২৮] এই নামে নীতিবিষয়ক ছোট গল্প বা কৌতুককর চুটকী কথা থাকিত। উলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীঃ অঃ প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার ন্যায় আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহুল্য ভয়ে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও যথোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক যুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ যাহার দাড়ী উঠে নাই এমত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।" (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুকাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল।[২৯] মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৮। "ইতিহাস" এ স্থলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কেরীর "ইতিহাসমালা" বা তারাচাঁদ দত্তের "মনোরঞ্জনেতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকের নাম হইতে বুঝা যায়।

২৯। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in* 1857. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও দ্রষ্টব্য। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব ধরিয়াছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০) সমাচারদর্পণ ১৮২১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাঙ্গালা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ফাইল পাইয়াছি; এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ফাইল (অসম্পূর্ণ) পাইয়াছি। এই সকল ফাইল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

(১) ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্ত্তমান ছিল।

(৩) *Cal. Chr. Observer*, 1840, (February p 65-66) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মৃত্যু হয় নাই।

(৪) ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অদর্শন হইয়াছিল[৩০] এবং ৩রা মে শনিবার ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের যে ফাইল আমরা পাইয়াছি, তাহার ৩রা মে তারিখের কাগজে ১ বালম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নূতন পর্য্যায়ের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত মুখপত্র দেখা যায়,—

"সমচারদর্পণের নমস্কার।

পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনকথিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।" ইত্যাদি (১ বালম। ১ সংখ্যা। ১৮৫১, ৩রা মে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ)

(৫) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী বা ইংরাজী ও বাঙ্গালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৪-৫৫) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রীঃ অঃ পাদরীগণের সময়াভাববশতঃ হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রেতোদ্ধার মাত্র হয়। কিন্তু ১৮৪২ খৃঃ অঃ হস্তান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার লেখক কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে দর্পণের অদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, মার্শমান সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুত্থানের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্য্যন্ত ইহার দ্বিভাষিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহা প্রথম দ্বিভাষী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই।[৩১] *Cal. Chr. Observer* 1840 উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে (পৃঃ ৬৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা দ্বিভাষী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মৃত্যু ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী ছিল।

(৬) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বালম ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বালম লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৭) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কণ্ঠদেশে লিখিত আছে,—"Serampur ; Published every Saturday Morning।" এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

(৮) ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—"Published Every Wednesday and Saturday Morning"। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—Published at Serampure every Saturday Morning।" ১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

(৯) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শমান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণেকপার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তার কেরী

৩১। পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫৫), ১৮২৯ খৃঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ দ্বিভাষী হইয়াছিল। ইহা সম্ভব। কিন্তু আমরা ইহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পারসী ভাষাও উপেক্ষিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।

সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই কপকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেণ্ড (ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা মে) শেষভাগে লিখিত আছে,—"শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌন্সেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যায় কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

"সেলাম পুরঃসর নিবেদনমিদং গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের বহুকালের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্ত্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (*Return relating to Bengali publications.* 1859, p. xl) এবং ইহা বোধ হয় কিঞ্চিদধিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্তি হইয়াছিল (Long, *Return* etc. 1855. p. 141)। ইহার মৃত্যুর পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেণ্ড সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন।[৩২]

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩১-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের ফাইলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক ফাইলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের ফাইলের বিবরণ দেওয়া গেল; বারান্তরে পরবর্ত্তী ফাইলসমূহের বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত ফাইল আমার ব্যবহারের জন্ম আনাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

৩২। *Bengal Academy of Literature* পত্রিকায় (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্ম দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২২ হইতে সমাচারচন্দ্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চন্দ্রিকার সহিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি*

১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রদহের ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমে মহিষ ও মানুষের মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে লাল আঁটাল কর্দ্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্ব্বউত্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বারুইপুরের[১] কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫'।৬' ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ২২'।২৩' ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার[২] উপর হইতে ২' ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭'।১৮' ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরে[৩] উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮'।১৯' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাভির[৪] কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭'।৮' ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫'।১৬' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিয়াবুরুজের[৫] কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০' ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাদা ঝরঝরে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০' ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩'।১৪' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে প্রায় ১৪' ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দ্দম বর্ত্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত কালের জঙ্গল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল আঁটাল কর্দ্দমরূপে অতীত কালের জঙ্গলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) খুলনায়[৬] স্থানবিশেষে উপরের ৪'।৫' ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭'।৮' ফুট

---

* যশোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

১-৬। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর রোডের নিবাসী মিঃ আর, সি বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ১২´।১৩´ ফুট কাল আঁটাল কর্দ্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত জঙ্গলের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল ছিল। জঙ্গলের অঙ্গার সংস্পর্শে কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) উস্তির কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর শাদা বালি ও কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর ঈষৎ ফেকাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। ইহার স্থূলতা ৩´ ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দ্দম কোন কোন স্তর-বিন্যাসে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিন্যাসে ইহা প্রায় উপর হইতে ১০´।১১´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙ্গের আঁটাল কর্দ্দম-স্তরের বেধ প্রায় ৩´।৪´ ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিশা যাইবার পথে এক স্থানে ২´।২.৫´ ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিশার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। একটি ভদ্রলোক ঐ কর্দ্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—"গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল ?"

(৪) আলমপুর,[১] লুঙ্গি ও বজবজে, মাটি খুঁড়িতে লাল বা ফেকাসে লাল রঙ্গের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়দার[২] এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দ্দম এত লাল যে, পুকুরের পাঁক পর্য্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর[৩] নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩´।৪·৫´ ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাযুক্ত লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজু অঞ্চলের-পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গঙ্গার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতায়[৩] লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দ্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়। এই বালি বর্ত্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিন্যাসের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। মাকড়দা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

গঙ্গার বালি হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তর প্রায় ৩´ ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬´।৭´ ফুট লালচে দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৬´।৭·৫´ ফুট ফেকাসে লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়।

(৮) তারকেশ্বরে লাল বালি উঠান হয়। ইহা মগরার বালির মত। এই স্থানের কর্দ্দম গাঢ় লাল। ইহা বালির উপরে অবস্থিত।

(৯) মগরার[১] নিকটবর্ত্তী সুলতানগাছায় ৩´ ফুট হইতে ৮´ ফুট নিম্নে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি-স্তরের প্রথম ২˝।৪˝ ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙের ও শক্ত। ইহা মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। উক্ত বালিই মগরার বালি নামে বিখ্যাত। সুলতানগাছার এই বালির উপরের কর্দ্দমস্তর ৩´ হইতে ৮´ ফুট গভীর। এই কর্দ্দমস্তর নিম্নভাগে অত্যন্ত লাল, কিন্তু যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই ফেকাসে বলিয়া অনুমান হয়। জমীর উপরের কর্দ্দম সাধারণত ঈষৎ লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নিম্ন হইতে কর্দ্দম উঠাইয়া, সেই কর্দ্দমে দেওয়ালের গাত্র লেপন করিলে, বাড়ীর রং গাঢ় লাল দেখায়। সুলতানগাছার বালিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুটিকা ও বালির গুটিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ইহা ভাঙ্গিলে ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাটির পরদা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করতজ (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎ-পাত্রের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুম্বক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বালির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বালি পতনের শেষ অবস্থা মনুষ্যের সভ্যতার সময় ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুটিকাগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। এগুলি ভাঙ্গিলে ভিতর কাল দেখায়; কালর সঙ্গে ঈষৎ লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুটিকাগুলির ভিতরে করতজ দেখা যায়। এগুলির—অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্প-সংখ্যকই অতি নিকট হইতে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে গুটিকাগুলি বুড়বুড়ী দেয় না। প্রস্তর-গুটিকাগুলি ক্ষার-প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান হয় ও তৎপরে জলস্রোতে আসিয়া বালির সহিত সঞ্চিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুটিকাগুলিকে লাটেরাইট বলা চলে। বালির গুটিগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

১। প্রায় ৪ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সান্যাল এম্ এস্ সি মহাশয় মগরায় বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও ছিলাম। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। যাহাই হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে সুলতানগাছা, মানাদ ইত্যাদি স্থানের ভূতত্বে আমার মোটামুটী ধারণা ছিল। প্রবন্ধ লিখিতে আর যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সুলতানগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি ক্ষীণভাবে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত করিলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বালির গুটির কাল অংশ বুড়বুড়ি দেয় না। এ কাল অংশগুলি পূর্ব্বে, উপরোক্ত প্রস্তরগুটিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানা এগুলির চারি দিকে যুক্ত হইয়াছে। সুলতানগাছার বালির সহিত গণ্ডোয়ানা[১] প্রস্তরাবলির অন্তর্গত—"Iron-stone shale"এর ক্ষুদ্রাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্দ্ধমানের[২] রাঙ্গা মাটি প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন অংশের মাটি লাল ও কোন কোন অংশের মাটি অল্প ফেকাসে। স্তর-বিন্যাসের কোন কোন অংশে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন স্তর-বিন্যাসের উপর হইতে ২″।৩″ ইঞ্চি নিম্নে ও কোন স্তর-বিন্যাসের ৪′ ফুট নিম্নে দৃষ্ট হয়। বাঁকা নদীর শাখা খোসীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুড়িয়া পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২′ ফুট নিম্নে, ৪′ ফুট গভীর লাল বালিযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের[৩] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাতে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২″।৩″ ইঞ্চি অত্যন্ত লাল ও ঈষৎ শক্ত। এই শক্ত বালি মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। সুলতানগাছার বালুকা-স্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও ঈষৎ শক্ত ২″।৩″ ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে পাঁচেট যুগের কর্দ্দম-প্রস্তর বর্ত্তমান আছে; ইহা অত্যন্ত লাল। এই স্থানে ল্যাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। আসানসোলে "Iron-stone shale" প্রস্তরও আছে। মগরার বালির ভিতর যেরূপ প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের জমির উপর ও ক্ষুদ্র নালার লাল বালির ভিতর ঐরূপ প্রস্তরগুটিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরগুটিকা ও স্থানীয় ল্যাটেরাইট এক ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের কর্দ্দম প্রচুর লৌহময়।

(গ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) মজিলপুরের[৪] স্তর-বিন্যাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর নাই। উপরের ৩′ ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭′ ফুট আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক। এক স্থানে

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পূর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দে সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয় ছাত্রদিগকে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্ত আসানসোলে যান। আমি এই সঙ্গে গিয়াছিলাম ও লাল বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৪। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪´।৫´ ফুট, লাল কর্দ্দমের রং বেশী ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়।

(২) ফুটীগোদার[১] স্তর-বিন্যাসে লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয় নাই। এ স্থানের উপরে ৩´ ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর ৬´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর। আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে কাল পাঁক দেখা যায়।

(৩) পিলারটাটে লাল আঁটাল কর্দ্দম নাই। এ স্থানের উপরে ৭.৫´ ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক।

২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কর্দ্দম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায়, তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কর্দ্দমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কর্দ্দম-স্তরের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, ঐ সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে এই দেশের কর্দ্দমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটিয়াছিল। বিশেষ অবস্থা এই যে, দামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিদ্যমান নাই। শিবপুরের নিম্নে গঙ্গা, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারেব উত্তরে প্রবাহিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্ব্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত রঙের বিশেষত্বের বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাউক, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, আসানসোল ও মগরার লাল বালির উপর ২´´।৩´´।৪´´ ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উভয় স্থানের বালিতে ক্ষার-প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরাইটের অংশ। দুই স্থানের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায়। আসানসোলের পাঁচেট ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধ্বংসে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি হয়। দামোদর আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরাবলির[২] ভিতর দিয়া প্রবাহিত

১। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিছু নিম্নে দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাদ, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাদ সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের পূর্ব্ববিবৃত লাল কর্দ্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, আসানসোলের পাঁচেট, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন ধ্বংস পদার্থ ও মৃৎপাত্রাংশ প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের দ্রব্যাদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু, আমতা, মাকড়দা, এমন কি, মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতার ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্তির অনুসারে প্রস্তরগুটিকা, মৃৎপাত্রাংশ, লাল বালি ও লাল কর্দ্দম বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহা হইলে সুলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তিস্থান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচেট, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রদহ), উস্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়দার জলস্রোত অতি কম থাকায় লাল কর্দ্দম-স্তর বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাজু, আমতা, তারকেশ্বর, সুলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকায় বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ যতই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্য্যন্ত বালি ও কর্দ্দম বহিবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্য যে সকল স্থানে পূর্ব্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দ্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কালে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্ব্বের প্রবল জলস্রোত ক্ষীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দ্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব্ব অপেক্ষা কমিয়া আসা। ইহার বিষয় পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বলিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে অমড়াল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাদাটে রঙের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন যেরূপ শাদাটে বালি নিক্ষিপ্ত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতার জমী খুঁড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মাজুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি সন্নিকটে। বর্ত্তমান কানা নদী ও কুন্তল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পলিভূমির উপর মানাদ,

সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু ইত্যাদি স্থান। এই সকল স্থানে কুন্তল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মজা গর্ভদেশ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও মাজুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই স্থানগুলি বর্ত্তমান দামোদরের উপর বা অতি সন্নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে স্থির বলা যাইতে পারে, আসানসোলের নিম্নে বর্ত্তমান দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে, উপরের শাদাটে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলের নালাগুলি বালি পড়িয়া রুদ্ধ হওয়ায় কেবল লাল কর্দ্দমময় জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের দুই পারে (বাঁধ না থাকিলে) বহু দূর পর্য্যন্ত এখনও লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলের উত্তর-পশ্চিমে[১] ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত দামোদর ও বরাকর নদদ্বয় ধরিয়া গেলে পাঁচেট বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই জন্যই এ অঞ্চলের বালি শাদা। এই বালিই ক্রমে নিম্নের দিকে অনডাল, আমতা প্রভৃতি স্থানে দামোদর-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্ব্বের লাল বালিকে চাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জিলাতে[২] ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আসানসোলের উত্তরের এবং বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরাইটময়[২] দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে, এই নদীগুলি গঙ্গার জলে লাটেরাইট প্রস্তরেব ধ্বংস হইতে উৎপন্ন লাল কর্দ্দম আনিয়া দেয় ও পূর্ব্বেও দিত। মগরার পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল কর্দ্দম-স্তর লক্ষিত হয়, উহা গঙ্গার এই লাল কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর হইল,[৩] অতীত-জঙ্গলময় দ্বীপগুলি কর্দ্দম-চাপা পড়িয়াছে। আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের নিদর্শন[৪] প্রায় ৮।১০ হস্ত বা ১২´।১৫´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অক্ষাংশে। গঙ্গা-দামোদর পলিভূমির গঠন, দক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতন[৫] যেরূপ ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এক অক্ষাংশের কতকগুলি পরিবর্ত্তন মোটামুটি এক প্রকার ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই দুই স্থানের অতীত জঙ্গল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-চাপা পড়িতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখা যায়, $\frac{৫৫০০}{১২}$ = ৪৫৮ বা $\frac{৫৫০০}{১৫}$ = ৩৬৭ বৎসরে এক ফুট কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৫০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India (Raniganj section) by george A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A R. S. M. page 174-177.

৩। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

৪। আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

মোটামুটি এক ফুট করিয়া কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটামুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১]

আমরা দেখিয়াছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অন্ত কর্দ্দমস্তর ব্যতীত লাল কর্দ্দমস্তর প্রায় ৬´।৭.৫´ ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অন্ত কর্দ্দমস্তর ব্যতীত মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল কর্দ্দমস্তর দেখা যায়। নানা পার্থক্য ও বিশেষত্ব ধরিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর যত লাল কর্দ্দম বহন করিয়াছে, গঙ্গা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দ্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, যতটা দেশ হইতে লাল কর্দ্দম ধৌত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে যতটা দেশ ধৌত হইয়া লাল কর্দ্দম গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরে বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। সম্ভবতঃ ধৌত হওয়ায় কমিয়া গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ২´।৩´ ফুট দোআঁশ মাটি ও কোন স্থানে ১০´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর লক্ষিত হয়। তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে দোআঁশ মাটি ও আঁটাল কর্দ্দম, লাল কর্দ্দমস্তর হইতে নূতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরেই বর্ত্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে দোআঁশ মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের ঢালু গাত্রের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে এ স্থানেও দোআঁশ মাটি, লাল আঁটাল কর্দ্দম হইতে নূতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে দোআঁশ মাটি পাওয়া যাইবে, সে স্থানে দোআঁশ মাটি পুরাতন। এরূপ ব্যাপার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্তরবিন্যাসে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পলিভূমির গঠন ও বিস্তৃতিলাভ১ হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব্ব-উত্তরের স্থানসমূহ হইতে নূতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন মজিলপুরের এক স্থানে) ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪´।৫´ ফুট গভীর; ইহার নিম্নে বালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দ্দম, অত্যন্ত ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ লৌহ থাকিলে কর্দ্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লৌহের পরিমাণ যতই কম হয়, কর্দ্দমের রং ততই ফেকাসে দেখায়। লৌহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দ্দম ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়। যাহাই হউক, এই ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি ঈষৎ লাল্ আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, অন্যটি দোআঁশ, একটি বহু পুরাতন, একটি নূতন। মোটামুটি বলা যায়, ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটির

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

উৎপত্তিস্থান ও নিক্ষেপণ হিসাবে লাল আঁটাল কর্দ্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও যতটা লাল কর্দ্দম গঙ্গায় পূর্ব্বে আসিত ও পরে যতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল কর্দ্দমস্তর পুরাতন ও এইগুলির স্থূলতাও অত্যন্ত অধিক; আর দেখা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, তাহার স্থূলতা কম, দোআঁশলা ও রঙ্গে অত্যন্ত ফেকাসে। এই সকল হইতে অনুমান হয়, গঙ্গা যে দেশ হইতে লাল কর্দ্দম পায়, সেই দেশ, পূর্ব্বে বেশী লাল কর্দ্দম উৎপন্ন করিত ও বেশী লাল কর্দ্দম সেই দেশ হইতে ধৌত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দ্দমের উপর প্রায় ১০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। মেটে রং বলিতে যে রং বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই রং। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২ বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (নলগোঁড়া) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি দোআঁশলা ও সে স্থানের ভূমি যেমন পতিত হইতেছে, তেমন পলিও সঞ্চিত হইতেছে। খুব কম দিন পর্য্যন্ত পলি সঞ্চয়ের কোন বাধা হয় নাই[১]। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার দোআঁশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধরিয়া ধৌত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দ্দম-সঞ্চয় হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০´ ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩´ ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এখন ২৬২ × ১০ = ২৬২০, ২৬২ × ১৩ = ৩৪০৬। তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গায় লাল কর্দ্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হইত, তাহাও বেশী ধৌত হইত ও কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম ১৩´ ফুট হইতে ২২´ ফুট গভীর। এখন ২৬২ × ১৩ = ৩৪০৬, ২৬২ × ২২ = ৫৭৬৪। তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া গঙ্গা বেশী লাল কর্দ্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দ্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধৌত হইয়াছে। শেষ কথা—প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দ্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন ও ধৌত হওয়া বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর পাওয়া যায়, ঐ সকল

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই কর্দ্দম বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরা-ইট প্রস্তরময় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দামোদরের একটি শাখা বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌছিয়াছিল। গঙ্গা কালীঘাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটির জন্যই মগরাহাটের যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বালিও দেখা যায়।

(৩) আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ভ খুলিলে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যাইবে। এই লাল বালির উপরিস্থিত শাদাটে বালি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বালি চাপা দিয়াছে।

(৪) সুলতানগাছার বালি পতনের শেষ কাল, মনুষ্য-সভ্যতার সময়।

(৫) গঙ্গা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দ্দম বহন করে। দামোদর লাটেরা-ইট প্রভৃতি প্রস্তরময় দেশের যতটা পরিসরের ধোয়াট প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গঙ্গা অনেক বেশী পরিসরের ধোয়াট্ বহন করিয়া থাকে।

(৬) আমতা অঞ্চলে বা কলিকাতার এক অক্ষাংশে দামোদর-পলিভূমিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইয়াছে।

(৭) বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্ব্বে যেরূপ বৃষ্টি হইত ও প্রস্তর ধৌত হইত, এখন তত বৃষ্টি হয় না ও সেই জন্য প্রস্তরগুলিও তত ধৌত হইতে পারে না। প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী বৃষ্টি হইত ও বিশেষভাবে প্রস্তর পরিবর্ত্তন করিতে ও ধৌত করিতে পারিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

গঙ্গা-দামোদর পলিভূমি।

(গভর্ণমেণ্টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১ ইঞ্চি = ৪ মাইল

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী দামোদরের বিলুপ্ত শাখা } - - - - -
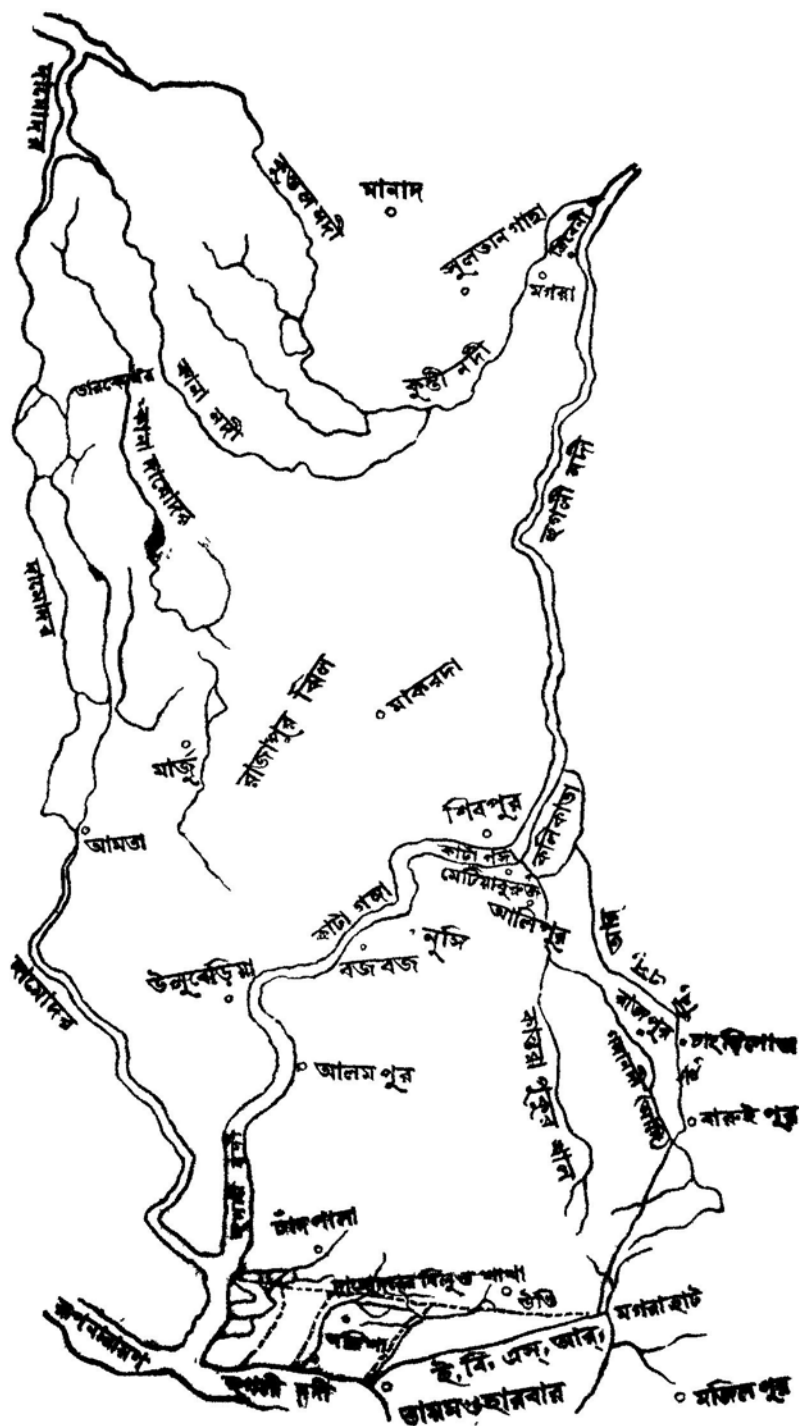
ঋকার-তত্ত্ব

§ ১। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানান্তরে[1] এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আজো কিছু বলিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ আমার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথার সহিত বর্ত্তমান কথা কয়টি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্যান্য বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষায় ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (ক র্+উ+তি) ক রো তি (ঋ০)।

√ ভৃ " (ভ র্+অ+তি) ভ র তি (ঋ০)।

(খ) ঋ=ই র্, যথা—

√ হৃ হইতে (জি-হি র্+স+তি) জি হী র্ষ তি (অথ০)।

√ কৃ " (চি-কি র্+স + তি) চি কী র্ষ তি (অথ০)।[2]

√ কৄ[3] " কি র (ঋ০, লোট্, ম০ এক০)।

(গ) ঋ=উ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (কু র্+উ+ম স্) কু র্মঃ (ঋ০);

" " (কু র্+উ+হি) কু রু (ঋ০)।

" " (কু র্+উ) কু রু (=ঋত্বিক্), নিঘণ্টু, ৩. ১৮।

√ তৄ " (ত—তু র্+ই) ত তু রি (ঋ০, =বিজেতা,

দ্রঃ—পা০ ৭, ১,১০৩)।

√ ভৃ " (বু-ভু র্+স+তি) বু ভূ র্ষ তি (ব্রা০; দ্রঃ—√ মৃ হইতে

মু মূ র্ষ তি, ইত্যাদি, পা০ ৭, ১, ১০২)।

১। বা ঙ্ লা র উ চ্চা র ণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"লাক্ষণিকস্যাপ্যত্র গ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ৠকার ঋকারেরই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই জন্যই পাণিনি কতকগুলি উকারান্ত ও ৠকারান্ত ধাতু হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন (৭.৩.৮০)। Macdonell সাহেব নিজের (বড় ও ছোট উভয়) বৈদিক ব্যাকরণেই বিদারণার্থক প্রচলিত দৄ ধাতুকে হ্রস্ব-ঋকারান্ত করিয়াই ধরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(খ) ঋ=এ র্, এ রে

ঋকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ অবেস্তায় ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবেস্তা
বৃ ক	বে হ্ র্ক।[৪]
মৃ ত	* মে র্ ত, মে ষ।[৫]
পৃ ত না	* পে র্ ত না, পে ষ না (=সংগ্রাম)।
কৃ ত	কে রে ত।
আ ভৃ ত	আ বে রে ত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা—

(ক) ঋ=র, যথা—

ঋ জু (ঋ০) হইতে র জি ষ্ঠ (ঋ০, অবেস্তা র জি স্ত ;
লৌকিক সংস্কৃত ঋ জি ষ্ঠ, পা০ ৬, ৪, ১৬২)।

√ কৃ হইতে ক্র তু (দ্রঃ—উণাদি, ১, ৮০)।

√ দৃ হ্ " দৃ হ্য (ঋ০, লোট্ ম০ এ০), দৃ ঢ় (ঋ০),
কিন্তু দ্র হ্য ৎ (ঋ০, 'দৃঢ় করিয়া')।

√ দৃ শ্ " দ্র ষ্টু ম্ (ঋ০), দ্র ক্ষ্য তি (ব্রা০)।

√ মৃ দ্[৬] হইতে ম্র দ (ঋ০)।

সৃ ক ন্ (ঋ০) ও স্র ক (ঋ০) উভয়ই হয়।

(খ) ঋ=রি, যথা—

√ কৃ হইতে ক্রি য় তে (ঋ০)।

√ মৃ " ম্রি য় সে (ঋ০)।[৭]

৪। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে এ র্ শব্দের মধ্যে হ আগম হইয়াছে। তুলঃ—বর্তমান বিহারী ভাষায় (সর্বরিয়া—বস্তি জেলা, ও মধেসী—চম্পারণ জেলা) ম হ তা রি (=মা, মা তৃ শব্দ হইতে)।

৫। সংস্কৃত ত=অবেস্তা ষ, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37 ; Jackson's Avesta Grammar, Part 1. $ 163 ; Burgmann, Vol IV. 156.

৬। √ মৃ দ্ ও √ ম্র দ্ বস্তুত একই।

৭। √ ঋ (গতি)=√ রি (প্রবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঋ=রু, যথা—

বৃক্ষ=রুক্ষ[৮] (ঋ০, ৬, ৩,৭) ।[৯]

√দৃ (তুলঃ—দৃতি=চর্ম্ম বা চর্ম্মপুটক) অথবা √দৄ হইতে

দ্রু (ঋ০, দারু, দারুপাত্র), দ্রুম (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫,১১) ।[১০]

(ঘ) ঋ=রে,[১১] যথা—

গৃহ হইতে * গ্রেহ, গেহ (বাজ০ স০ ৩০,৯) ।

গৃহ্য " * গ্রেহ্য, গেহ্য (ঋ০ ৩,৭০,৭ ; বাজ০ স০, ১৬,৪৪) ।

৮। সায়ণ এখানে ইহার অর্থ 'দীপ্ত' করিয়াছেন, কস্তু মূলে "ওষধী" শব্দের সহিত ইহার প্রয়োগ থাকায় বৃক্ষ অর্থই ভাল মনে হয়।

৯। পালি ও প্রাকৃতে বৃক্ষ স্থানে রুক্‌খ সুপ্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত রুক্ষ শব্দই পালি-প্রাকৃতের নিয়মে (অনাদিস্থিত ক্ষ=ক্‌খ) রুক্‌খ হইয়াছে। বৃক্ষের বকার অন্তস্থ হওয়ায় সহজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—√বৃধ্—√ঋধ্, বৃদ্ধি—ঋদ্ধি, বৃষভ—ঋষভ (জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবকে বুঝাইতে বৃষভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, দ্রঃ—লঘীয়স্ত্রয়, ১), বৃণোতি—উর্ণোতি।

১০। এই দ্রু শব্দ যে, √দৃ অথবা ইহারই অপর রূপ √দৄ ('বিদীর্ণ করা' বা 'বিদীর্ণ হওয়া') হইতে হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য-ধাতুমালার (Aryan Roots) ইহা (√দের্, √দৃ) অন্যতম। সংস্কৃত ও অবেস্তার দ্রু, সংস্কৃত দারু (অবেস্তা দাউরু), দৃতি, তরু, গ্রীক *drus* (=বৃক্ষ, বিশেষভাবে ওক),*drumos* (ওকের জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree, tear* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দ্রষ্টব্য—Eur-Aryan Roots of J. Baly, Vol. I. p. 496 ; সংস্কৃতে দ্রু ও তরু শব্দের বড় বিচিত্র বুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অমরের টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত উণাদি সূত্র অনুসারে (১.১৭) দ্রু শব্দের বুৎপত্তি দিয়াছেন—"দ্রবতি ঊর্দ্ধং, দ্রু গতৌ...ডুঃ," যেমন শতদ্রু, ইত্যাদি। তরু শব্দের ব্যুৎপত্তি "তরতি, তরন্ত্যনেন ইতি বা (উণা০ ১.৭)। কিন্তু দারু শব্দের ব্যুৎপত্তি উণাদিসূত্রে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—"দীর্যতে ইতি দারু।" পাণিনি দ্রুম শব্দের বুৎপত্তি ঠিক দিয়াছেন (৫.২.১০৮), দ্রু শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ম প্রত্যয় ; কিন্তু তিনি দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেন নাই। এখানে দ্রু শব্দের অর্থ দারু বা কাঠ, অতএব দ্রু, অর্থাৎ দারু বা কাঠ আছে বলিয়া বৃক্ষ দ্রুম। দ্রুম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৫ ১১) আছে, নিরুক্তেও পাওয়া যায় (৪.১৯, ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দারু অর্থে দ্রু শব্দই ছিল। পরে দ্রু আছে বলিয়া বৃক্ষ-অর্থে দ্রুম হইল। তাহার পরে আবার দ্রু, দ্রুম উভয়ই বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পাণিনির সময় পর্য্যন্ত দ্রু দারু-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ায় অবিশেষে উভয় শব্দই বৃক্ষবাচী হইয়া পড়িলে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ পাণিনির উল্লিখিত (৫.২.১০৮) সূত্রে দ্রুম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলেন—"দ্রুর্বৃক্ষঃ সোঽস্যাস্তি অবয়বত্বেনেতি দ্রুমো২পি বৃক্ষ এব" (!)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দীর্ণ হয় বলিয়াই কাষ্ঠ দ্রু, দারু। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উদ্ভিদ্ (√ভিদ্ বিদারণে)।

১১। প্রাকৃত-প্রকারে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল অকার থাকে।

মৃ হ্র হইতে * ম্রে হ্র, মে হ্র (শতপথ)।[১২]

ঋকারের এই রে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই জন্যই তাঁহাদের শিক্ষা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, (পূর্ব্বোল্লিখিত বা ঙ্‌ লা র উ চ্চা র ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে তাঁহাদের মতে কৃ ষ্ণো ২ সি (বাজ০ স০, ২,১) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ষ্ণো ২ সি।

§ ৫। বৈদিক ভাষায় ঋকারের যে পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে; এ জন্য লৌকিক সংস্কৃতের অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষার সহিত এই দুই ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যাঁহারা এই দুই ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। স্বরাদি রূপ (§ ৩), যথা—

(ক) ঋ=অ র্‌ (অর), যথা—

√ মৃ হইতে ম র তি (পা০); ম র ই (প্রা০)।

(খ) ঋ=ই র্‌ (ইর), যথা—

√ গৃ হইতে গি র তি, গি ল তি (পা০); গি র ই, গি ল ই (প্রা০)।

(গ) ঋ=উ র্‌ (উর), যথা—

√ কৃ হইতে কু রু মা ন (পা০)।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ (§ ৪)। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন (র) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।[১৩] উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ=*র=অ, যথা—

কৃ ত হইতে * ক্র ত, ক ত (পা০), ক অ (প্রা০)।

নৃ ত্য „ * ন্র ত্য, ন চ্চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত বে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই √বৃত্‌ হইতে হইয়াছে,—√ বৃ ত + অ ন=* ব্রে ত ন=বে ত ন (তুলঃ—ব র্ত্ত ন, বৃ ত্তি)। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকগণ ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—√ বী+তন (উণা০ ৩,১৫০)।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ) ঋ = *রি[১৩] = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা০)।
ঋ তে „ রি ত্তে (পা০)।
শৃ ঙ্গ „ * শ্রি ঙ্গ, সিঙ্গ।
সৃ গা ল[১৫] হইতে * স্রি গা ল, সি গা ল (পা০), সি আ ল (প্রা০)।

(গ) ঋ = *রু[১৪] = উ, যথা—

বৃং হ য় তি হইতে ব্রূ হে তি (পা০)।[১৬]
বৃ দ্ধ „ * ব্রু ড্ঢ, বু ড্ঢ।

(ঘ) ঋ = * রে = এ

বৃ হ ৎ ফ ল হইতে * ব্রে হ ৎ ফ ল, বে হ প্ ফ ল (পা০)।
বৃ ন্ত হইতে * ব্রে ন্ত, বেণ্ট (প্রা০)।[১৭]

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্ত্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ০ প্রা০, ১৮, কাশী০ ৩৫ পৃ০ ; বা০ প্রা০, ১,৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূলীয়), এবং ইহা সেখানে হনু-মূল[১৮] দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব র্স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্গ উচ্চারণ করিতে

১৩। কখনো কখনো প্রয়োগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ষ্ঠ, স্তা ল, সূ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ষ্ঠ, শ্তা ল, শূ ক র।

১৬। এখানে 'বৃং' শব্দের গুরুমাত্রা স্থির রাখিবার জন্য হ্রস্ব উকারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বো ণ্ট ও বি ণ্ট শব্দও হয় (চণ্ড, ২.৫ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯ ; শুভচন্দ্র, ১.২.৯৩ ; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩ ; বররুচি, ১.১০ ; ত্রিবিক্রম, ১.২.৮৬ ; ক্রমদীশ্বর, ২.০৭)। বে ণ্ট হইতে বাঙ্লায় বেঁ ট, বে ট। বৃ ন্ত—*ব্র ন্ত—ব ণ্ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্লায় বোঁ ট। প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার (ষড্ভাষাচন্দ্রিকা, ৩৫২ পৃ০) বো,ণ্ট পদও দিয়াছেন, ইহা হইতে আমাদের (বো ণ্ট ক—বো ণ্ট অ—) বোঁ টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিবৃত মুখের দুই পার্শ্বভাগ ("হনুমূল আস্যপার্শ্বভাগয়োর্ম্মূলে"—বৈদিকাভরণ-টীকা, তৈ০, প্রা০, ২. ১২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম ব র্স্ব।[১৯]

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেকে বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধও আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহা মূর্দ্ধন্য—"স্যুর্মূর্দ্ধন্যা ঋটুরষাঃ" (পাণিনি-শিক্ষা, ১৭)। মূর্দ্ধা বলিতে মু খ বি ব রে র উ প রি ভা গ (তৈ০ প্রা০, ২,৩৭, বৈদিকাভরণ), যে স্থান হইতে টবর্গ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দন্তের দিকে ক্রমশ এই কয়টি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মূর্দ্ধা, (৩) বর্স্ব, (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্ব্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মূর্দ্ধা ও (৩) বর্স্ব, এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রয়োজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের ন্যায় রকারেরও উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলীয় (বাজ০ প্রা০, ১,৫৮ ; ঋ০ প্রা০, ১ম পটল, ৩৬ পৃ০ ; যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা, শিক্ষাসংগ্রহ, কাশী০ ৩৩ পৃ০) ; এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাজ০ প্রা০ ১,৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ০) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান বৎর্স্ব (বর্স্ব ?), ইহা বার্ৎস্ব[২০] বর্ণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২.৪১) ইহাই অভিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রের মধ্য-স্থান দিয়া দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মূর্দ্ধায়, (২) বর্স্বে ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাম্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মূর্দ্ধা বা বর্স্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা, বর্স্ব ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১৯। "ব র্স্বা নাম রেফ-টবর্গ-স্থানয়োর্ম্মধ্যপ্রদেশাঃ,"—বৈদিকাভরণ-টীকা (তৈ, প্রা, ২,১৮) ; "ব র্স্বেষু ইতি দন্তপঙ্‌ক্তেরুপরিষ্টাদ্ উচ্চপ্রদেশেষু,"—ত্রিভাষ্যরত্ন-টীকা (ঐ)। তুলঃ—ব ৎ স্ব (? ব র্স্ব) শব্দের দন্তমূলাদ্ উপরিষ্টাদ্ উচ্ছ্রূনঃ প্রদেশঃ,"—ঋ, প্রা, ১ম পটল, কাশী, ৩৭ পৃষ্ঠা, উব্বট-ভাষ্য।

২০। বার্ৎস্ব পাঠ বোধ হয় অশুদ্ধ, উব্বটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) ব র্স্ব বলিতে যাহা বুঝায়, বৎর্স্ব শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য টীকা, ১৯।

চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা হ্রস্ব, অতএব ইহার এক মাত্রা। প্রাতিশাখ্যকারগণ (বাজ° প্রা°, ১,৫৯-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন ; ইহাদের যথাক্রমে নাম অ র্দ্ধ মা ত্রা ($\frac{১}{২}$), অ ণু মা ত্রা ($\frac{১}{৪}$), ও প র মা ণু মা ত্রা ($\frac{১}{৮}$)। ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা ($\frac{১}{৪}$), অন্তে আর এক অণুমাত্রা ($\frac{১}{৪}$) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা ($\frac{১}{২}$) ; এইরূপে মোট ($\frac{১}{৪}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}=১$) এক মাত্রা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা)। ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে শুনিতেই পাওয়া যায় না ("ঋঌবর্ণে রেফলকারৌ সংশ্লিষ্টৌ অশ্রুতিধরৌ এ ক ব র্ণৌ"—বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬)।[২১] এই রকার সাধারণ রকার হইতে হ্রস্বতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ° প্রা°, ৮,১৪ ; দ্রঃ—অ° প্রা°, ১,৩৭, ৭১)। প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনায় বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে।[২২]

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয় কাহার? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্বরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই ($\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}$) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই আণুমাত্রিক স্বর দুইটি ক ণ্ঠ্য ("কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে…")। ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি? অকার ভিন্ন কিছু নহে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ১,৬৫ ; ঋ° প্রা°, ১,৮, কাশী° ৩৫ পৃ° ; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি° স° ৩১ পৃ°) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রাতিশাখ্যবিদ্গণ স্ব র ভ ক্তি র স্থলে (তৈ° প্রা° ২১,১৫) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। দ্রষ্টব্য—ত্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকাভরণ ব্যাখ্যায় (তৈ, প্রা, ২১,১৫) উদ্ধৃত বররুচি "ঋলোর্মধ্যে ভবত্যর্দ্ধ-মাত্রা রেফলকারয়োঃ"—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শিক্ষা-সংগ্রহ, ৩২ পৃ°,। ঋকারে যেমন রকার, ঌকারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক নিয়ম।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অবেস্তার দ্বারা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের ঋ অবেস্তা বর্ণমালায় বহু স্থলেই এ-র্-এ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে। এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে।॰ এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে একার রহিয়াছে, তাহা হ্রস্ব, ইংরাজী fed শব্দের e'র ন্যায় ইহা উচ্চারিত হয়। অবেস্তার একার তিনটি হ্রস্ব (short), দীর্ঘ (long) ও মধ্যম (middle) ; এ-র্-এ স্থলে হ্রস্ব।

গিয়া বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়।[২৩] "ব র্‌ হিঃ" (তৈ০ সং ১,৬,৮), এখানে মধ্যবর্ত্তী রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে (বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না)। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঋকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অভিপ্রেত মনে হয় (বাজ০ প্রা০, ৪,১৭ ; তৈ০ প্রা০, ২১,১৫, টীকা)।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। 'সে পথে আ স তে-আ স তে (=আসিতে-আসিতে) পড়ে গেল', এখানে মনে হয়, মধ্যবর্ত্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হয়। মে ঘ লা, বা দ লা, এখানেও ঘকারে ও দকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, মে ঘ্লা, বা দ্লা বলা হয় কি ?[২৪] যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। যাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, কিরূপ, উল্লিখিত আলোচনায় তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণু-মাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঋকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-র্‌-অ।

§ ১৫। সকলেই শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মানুষ চায় নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে যেরূপে যত সহজে পারে, তাহার বাগ্‌যন্ত্র যেরূপে যতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে ; ব্যাকরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঋকারের মূল উচ্চারণ কথ্য ভাষায় এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদির, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে যথাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-র্‌-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-র্‌ (অর্‌), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে র্‌-অ (র) হইয়া পড়িল ; যাঁহারা পূর্ব্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া (অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিলেন, তাঁহাদের নিকট অ-র্‌ (অর্‌) হইল, আর যাঁহারা পরবর্ত্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রায়

২৩। ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
চক্ষুর্ভিরণুভির্যোঽপরিমাণমিতি স্মৃতম্‌ ॥

২৪। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট র্-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল,[২৫] কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অর্ ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১৬। ঋকারের অন্যান্য পরিবর্ত্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্ব্বোক্ত অ-র্-অ, ইহাই ই-র্ (ইর্) ও র্-ই (রি), এবং উ-র্ (উর্) ও র্-উ (রু) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্ত্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, √ কৃ হইতে চি-কির্-স-তি, চি কী র্ষ তি; √ হৃ হইতে জি-হির্-স-তি হইতে জি হী র্ষ তি, √ কৄ হইতে কি র তি; এই সকল স্থলে ঋকার ই র্ হইয়াছে। আবার √ কৃ হইতে ক্রি য় তে, √ ভৃ হইতে ভ্রি য় তে, ইত্যাদি স্থলে তাহা রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে প্রায়ই সেই ঋকার স্থানে ই র্ অথবা রি হয়।

√ কৄ (=ক্+অ-র্-অ)+অ+তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্য উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র প্রথম হইতেই উদ্যত হয়, যেমন কাহাকেও আঘাত করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্য উদ্যত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ যাহা একই কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত রূপ অ-র্-এর কণ্ঠ্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকায়) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া ফেলে। ক্রি য় তে, ভ্রি য় তে; এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ+য+তে, √ ভৃ+য+তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য যকার থাকায় বাগ্‌যন্ত্র ইহা উচ্চারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ব্ব-বর্ণিত স্বরভাগকে কণ্ঠ্যের পরিবর্ত্তে তালব্য করিয়া ফেলে।

§ ১৭। ই র্ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (দ্বিতীয় গু ণ বি ধি) এ র্ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§§ ৩,৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ র্ অথবা রু হইবার নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্ব্বে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে প্রায় তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের যদিও অর্দ্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসন্নিধানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; তাহারই মাত্রার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ষ ট্, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং ষকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-গুরু-ভেদে এই মাত্রাদ্বয়ের ভেদ আছে। এই শব্দে শেষ ষকার ও টকারের মধ্যে ষকার অর্দ্ধমাত্রা (½) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্দ্ধমাত্রা (½), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিসাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অঙ্গীভূত, এ সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যে বহু কথা আছে (তৈ, প্রা, ২১,১, ইত্যাদি)।

√ কৃ+উ (+হি) হইতে কুরু, এখানে উ ওষ্ঠ্য বলিয়া তাহার উচ্চারণে বদ্ধলক্ষ্য বাগ্‌যন্ত্র ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠদ্বয়কে উপশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে (তৈ০ প্রা০, ২,২৪), এবং তাহাতেই ঋকারের অর্থাৎ অ-র্-অ-এর পূর্ব্বের ভাগ উ র্ হইয়া যায়। কিন্তু করো তি, এ স্থলে √ কৃ+উ+তি=(ইহার মধ্যবর্ত্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ায়) √ কৃ+ও+তি, এই জন্য ঋকার উর্ না হইয়া অর্-ই হয় ; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত ; অ কণ্ঠ্য ও উ ওষ্ঠ্য ; এই হেতু ঋকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠ্য অংশ অকার ; ইহারই প্রতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঋকারের অর্থাৎ অ-র্-অ ইহার আদি অংশের, অণুমাত্রিক কণ্ঠ্য অকারের কোনো পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক হওয়ায় কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্ হইয়া যায়। √ ভৃ হইতে ব, ভূর্ব তি, এখানেও ওষ্ঠ্য বর্ণ ভকারের সংসর্গে ঋকার উর্ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার বিধান হইতেছে (৭,১,১০২)—"উদ্ ওষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য।"

§ ১৯। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যভিচারী নহে। কিরূপে ঋকারের ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঋকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্, ইর্, উর্ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যায় একবারে রু হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় ঋকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঋকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও (বর্ণেও) ঋকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতের ব্যাকরণকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋকার তাহাতে নাই।[২০] এই জন্যই সিংহলী[২১] ও বাঙ্‌লা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২০। অপভ্রংশে কচিৎ দুই একটা পদে দেখা যায়, কৃ বা (কৃপা), তৃ ব (তৃণ), হে, চ, ৮, ৮২, ৮৩।

২১। ভারতের প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাসমূহের তত্ত্বালোচনায় সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋকে যে 'রুক্ষঃ' শব্দটি আছে, উহা 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে; ছান্দসে কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। 'ওষধীষু' সপ্তমীতে আছে, আর 'রুক্ষঃ' প্রথমার পদে 'অগ্নিঃ' এই উহ্য কর্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, 'ওষধী' শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া 'বৃক্ষ' অর্থের সূচনা হয় না। 'রুক্ষঃ'—অর্থ 'দীপ্তঃ'; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্ত্তনে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; আমাদের 'রুক্ষ মেজাজে' এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋকৃটির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন,—

দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্-

বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।

সূর্য্যের মত তেজ বা রশ্মি বিস্তারকারী যাঁহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত ফল-বর্ষণকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

'ঋ' অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'ভারতবর্ষের বর্ণমালা' ও 'ব্যাকরণের সন্ধি' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। 'অ' স্বরের 'আ' যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্ত-ভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া ওঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন; 'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরি-বর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ 'ঋ', জ, শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ 'ঈ'রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। 'ঋ' স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে 'উর্' হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented 'উ' ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটিয়া থাকে। অন্তস্থ 'ব' অক্ষরটির উচ্চারণ যে 'উ-অ', তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

রুক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

রু ক্ষ শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা বৃ ক্ষ হইতে হয় নাই. আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অন্ত উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদের রু ক্ষ শব্দটি বৃ ক্ষ হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজেই উল্লেখ করিয়াছি, সায়ণ রু ক্ষ শব্দের অর্থ দী প্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সায়ণকেই অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্ত্রটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলা দরকার,—

"দিবো ন যস্ত বিধতো নবীনোদ্
বৃষা রু ক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।"

সায়ণ ও তদনুসরণে বিজয়বাবু রু ক্ষ শব্দ এখানে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অনুকূল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তম্যন্ত (রু ক্ষে), এবং তাহাও আবার বহুবচনে (বৃক্ষেষু) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—'(কাম-) বর্ষণকারী (অগ্নি) বৃক্ষ ও ওষধি-সমূহে (তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার সময়) অত্যন্ত গর্জ্জন করিতেছে।' পদপাঠ যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ত্রুটি আছে। বেদের অন্তান্ত মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্ব্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ উজ্জ্বল হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির নিয়মভঙ্গ হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যাতারাও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত্র তুলিয়া দেওয়া যাউক—

"ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি
দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা।" ঋগ্বেদ, ৮,১১,১।

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত "রু ক্ষ ওষধীষু" ইহার সহিত "দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা" ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানেও পদপাঠ আছে—

"দেবঃ (প্রথমান্ত) আ মর্ত্ত্যেষু আ।"

সায়ণের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নে, দেবো দ্যোতমানস্ত্বং মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ মধ্যে ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্ম্মণাং রক্ষিতা ভবসি।" পাঠকগণ এখানে দেখিলেন, সায়ণ দে ব শব্দটিকে দুইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমার একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার বৈ

দুইবার নাই। মূলে দুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ আ=চ। সায়ণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া "মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্ত্তী ম র্ত্যে ষু পদের সপ্তমীর বহুবচন যোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমার একবচন থাকায় "দে বো দ্যো ত মা নঃ" বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলে না, ইহা সমুচ্চয়ার্থক দুইটি আ-শব্দই সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৮,১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদ্বা আকারদ্বয়ং সমুচ্চয়ার্থং। দে বে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। হে অগ্নে ত্বং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ ব্রতপা অসীতি পূর্ব্ববৎ।" *

এরূপ মন্ত্র আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

"ছান্দস" ভাষায় অন্যত্র যদি রু ক্ষ না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্দস, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākritism) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক্ষ হইতে রু ক্খ (=রু ক্ষ) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮,২,১২৭; বররুচি, ১,৩২; লক্ষ্মীধর, ১,৪,৭; সিংহরাজ, ৪,১; মার্কণ্ডেয় ১,৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ্য করা যাইবে?

আদিস্থিত অন্তস্থ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। দ্বৈ (=তু+বৈ), তৈ, স, ১,৭,১,৪; ৬,২; ২,২,৪,৮; ইত্যাদি; ষা ব (=তু+বাব), তৈ, স, ২,১,৫,৮; ইত্যাদি; অ ম্ব র্তি যো (=অনু+ব র্তি ষ্যো) অথ, স, ১৫,১,৫৬। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে রু ক্ষ শব্দ বৃ ক্ষে র ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ যে রু ক্ষ (=দীপ্ত), তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অর্থে বাঙলার "রুক্ষ মেজাজ" ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সায়ণের মতে) রুক্ষ শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানিমাত্র গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এইরূপে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাফ দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—যদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের রু ক্ষ আমাদের বাঙলায় ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

---

* এই মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদেও (১৯, ৫৯, ১) আছে, কিন্তু সায়ণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে এই একই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্য দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক লেখনীর নহে।

বৈদিক সংস্কৃতেও (মন্ত্রভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগে) রূ ক্ষ শব্দ আছে (রু ক্ষ নহে)। ইহা √ রূ ক্ষ (পারুষ্যে) হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরুষ, কর্কশ, শুষ্ক, অস্নিগ্ধ, অচিক্কণ, ইত্যাদি। অমরে (৩,২২৫) লিখিত হইয়াছে—"রূক্ষস্তপ্রেম্ণ্যচিক্কণে।" এখন 'রূ ক্ষ মেজাজ', 'রূ ক্ষ স্নান', 'রূ ক্ষ কথা' ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদের রু ক্ষ শব্দের সহিত যোগ অন্বেষণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংস্কৃতের এই রূ ক্ষ শব্দই বাঙ্‌লায় (মারাঠীতেও) কাহারো-কাহারো হাতে রু ক্ষ, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রু ক্ষ্ম পর্য্যন্ত হইয়াছে (ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত মঁক্ষু= লৌকিক সংস্কৃত মংক্ষু ; ম যূ র প ক্ষী=ম যূ র প ং ক্ষী=ম যূ র প ঙ্খী) প্রাকৃতে রূ ক্ষ হইতে রু ক্ খ হয় ; তাহা হইতে বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে রু খা ইত্যাদি। অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রু ক্ষ শব্দ আলোচনায় তাঁহার নিজপক্ষ কোনোরূপে সমর্থিত হইতেছে না।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি আমি এখনো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিব।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonautograph এর কথামাত্র শুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না। Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, "দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে ফুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে।" কেন? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, "উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়।" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়। তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রুক্ষ শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঋক্ষ শব্দ রূক্ষ অর্থে দেখিয়াছি। উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে আছে :—"ঋক্ষা বা ইয়ং অলোমকাসীৎ। সাকাময়ত। ওষধীভির্বনস্পতিভিঃ প্রজায়েয়েতি।" সায়ণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই (পৃথিবী) [পূর্ব্বে] অলোমকা (ওষধ্যাদি লোমরহিতা) এবং ঋক্ষা (মার্দবরহিতা, ক্রূরা) ছিলেন। [তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব]" এখানে সায়ণমতে ঋক্ষ অর্থে স্পষ্টতই মৃদুতারহিত—ক্রূর—রূক্ষ। ঋকার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম। পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নাম আপনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ গ্রামের অতি সন্নিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নাথুরামজী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলিতে সিদ্ধহস্ত। আবশ্যকীয় জৈন লিপিসমূহের অনুলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্ত্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া অনৈক কর্ম্মচারীকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপয়িতার নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অন্য দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নয়নগোচর হইল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, কার্য্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটী ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্ব্বদিন যেখানে প্রস্তরলিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অন্য দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী গণেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

এক্ষণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এইগুলি যত দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্ব্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ শ্রীরামপ্রসাদ কর্ত্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে শ্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের শ্রীলোচন নামক কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। "দয়াসিন্ধু দয়ারাম" কর্ত্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কন্যা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপির। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৬৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পুর্ব্বের।

১। শিব-মন্দির

শাকে রামর্ত্তুকালক্ষিতিপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-
দেশে কৈলাসাবাসপাদক্ষরদমিতসুধাসিক্তচিত্তা-
ন্তরাত্মা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-
মনাথেশ্বরায় প্রাদাদুচ্চৎপতাকং পরং (পর) পদমতু
লং লব্ধুকামঃ শিবায় ॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল
শাকে রামগজাঙ্গেন্দুমিতে সম্বৎসরে গতে
উত্তরায়ণে সিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ
শ্রীলরামপ্রসাদেন দ্বিজেন শম্ভুসেবিনা
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

৩। শিব-মন্দির

/৭ ওঁ শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং। রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতি-
গণিতে হায়নে চারুগেহে প্রাদাৎ স্বর্গগায় পিত্রোর্ম্মণিম-
য়বিলসদ্দীপ্যমানে ধরণ্যা(ং) স্বধর্ধুন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্য্যাং দ্বি-
জনৃপবিবুধৈর্ম্মন্যমানে শিবায় শ্রীল শ্রীলোচনা-
খ্যো নিজগুণবিদিতো নির্ম্মলাত্মা সুশীলঃ

৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্যে
শাকে চ রসবর্জ্জিতে
দয়াসিন্ধু দয়ারাম(ঃ)
ভবায় ভবনং দদৌ

৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

খশূন্যমৈত্রশাকে শ্রী
ভবানীতনুসম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপালমন্দিরং

৬। শিব-মন্দির[১]

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র
বঙ্গভূমীন্দ্রভামিনী
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রী
ভবানীশ্বরমন্দিরং

৭। দেবীপুর-মন্দির[২]

নবষণ্মিত্রমে শাকে
রামরুদ্রস্য কামিনী
মন্দিরং মোহিনীশস্য
নির্ম্মমে রামমোহিণী

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি একণে লোপ পাইয়াছে। তবে পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় যে, এখানে এই লিপির অনুযায়ী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া একই দিনে ও একই শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাঁকিনার কোন রাজমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু কর্ত্তৃক কৃত পাঠের দুই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।